প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ২৯ সফর, ১৪৩৭ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ ঈসাব্দ

নতুনরূপে নির্মিত আহমদীয়া মসজিদ
মসজিদে বাইতুল ইসলাম
মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ দুস্কৃতিকারীর আত্মঘাতী
বোমা হামলায় আহমদী মুসল্লিদের রক্ত ঝরানো হয়েছিল
পূর্বের টিনের ছাউনিযুক্ত এই মসজিদে

মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী মসজিদে বাইতুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের খণ্ডচিত্র

মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
স্থানীয় ইউ.পি. চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব

মসজিদে বায়তুল ইসলাম-এর
ভেতরের একটি অংশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসমাবেশ

উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করছেন
মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আ.মু.জা. বাংলাদেশ

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও আলহাজ্জ মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার সাহেবের সাথে
বোমা আক্রমণে আহত তিনজন মোহাম্মদ মইজউদ্দিন (পেছনে),
ছোট শিশু মোহাম্মদ নয়ন, এবং মোহাম্মদ সাহেব আলী

উদ্বোধনের এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অতিথিদের সাথে
রাজশাহী অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের একাংশ

বিস্তারিত বিবরণ ৪৫ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

যুগ-খলীফার কল্যাণমন্ডিত তাহরীকে সাড়া দিয়ে মু'মিন হয় ধন্য

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা আল্লাহ্‌র মনোনীত যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যখনই যে তাহরীক আসে তাতে অংশ নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুগ-খলীফার সকল তাহরীকে 'লাব্বায়েক'– বলে সাড়া দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণকারী সৌভাগ্যশালী এক জামা'তে পরিণত হয়েছে। এ সাড়া দেয়ার সুফল বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর লক্ষ্যনীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা প্রত্যক্ষ করে বিগলিত অন্তরে মু'মিন আল্লাহ তা'লার সমীপে সিজদাপ্রণত হয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করে; আলহামদুলিল্লাহ্‌!

যুগের চাহিদা মোতাবেক যুগ-খলীফা বিভিন্ন তাহরীক করে থাকেন। তেমনি দু'টি তাহরীক বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন হলো– তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ। আহমদীয়া মুসিলম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা আল মুসলেহ্‌ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এ মহান তাহরীক দু'টি করেন যথাক্রমে ১৯৩৪ ও ১৯৫৭ ঈসাব্দে। যা এখন চিরস্থায়ী এক কল্যাণময় রূপ পেয়েছে। মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় এসব তাহরীকের কল্যাণে আজ সারা বিশ্বে লাখো-লাখো পথহারা মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। তাহরীকে জাদীদের আর্থিক বছর শুরু হয় ১লা নভেম্বর থেকে আর ওয়াকফে জাদীদ ১লা জানুয়ারী থেকে।

গত ১১ নভেম্বর ২০১৬ জুমুআর খুতবার মাধ্যমে হুযূর (আই.) তাহরিকে জাদীদের ৮৩তম বছরের ঘোষণা প্রদান করেন। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আহমদীরা কিভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে আনন্দবোধ করেন এবং তাদের ধন-সম্পদে কিভাবে অগনিত বরকত সৃষ্টি হয় তার এক ঝলক তুলে ধরেন। আফ্রিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝেও কি রকম কুরবানীর মানসিকতা রয়েছে এবং তা কিভাবে অন্যদেরও ঈমান লাভের কারণ হয় এরকম বেশকিছু ঘটনা হুযূর (আই.) তাঁর খুতবায় উল্লেখ করেন, আবার এশিয়া ও ইউরোপেও মানুষ কিভাবে আল্লাহর পথে খরচ করে আর তারও প্রতিদান আল্লাহ তাদেরকে দেন, এমন ঘটনাও হুযুরের খুতবায় উঠে এসেছে। হুযুর বলেন, একজন বিবেকবান মানুষের জন্য আহমদীদের এই উদাহরণই সত্য অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট যে দারিদ্রতা সত্ত্বেও আহমদীরা আর্থিক কুরবানী করায় অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

তাহরিকে জাদীদের খাতে শুধু গতবছরই ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড আদায় হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌ !

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের স্কীম চালু করেন। যেহেতু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার আগমনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। আর এ আধ্যাত্মিক সিলসিলার ঐশী মনোনীত খলীফা সেই লক্ষ্যেই এসব স্কীম চালু করে আমাদেরকে আর্থিক কুরবানির সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের কারণ। আলহামদুলিল্লাহ্‌!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) জামা'তের তালিম তরবিয়তের যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে তাৎপর্যবহ। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পবিত্র কুরআন শরিফের তালিম ও জামা'তের শিশু-কিশোরদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ওয়াকফে জাদীদ এর ভিত্তি রেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) চেয়েছিলেন জামা'তের একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবক– যারা বাড়ি ঘর আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে দূরে কোথাও সুফিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়াগণের মত ইসলাম ও কুরআনের আলো ছড়াবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, আজও এমনই এক সময় যখন আমাদের যুবকেরা, অন্তরে যাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানির প্রেরণা আছে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানে নিজেদের জন্মস্থানের মত করে বসবাস করবে। আস্তে-আস্তে আশেপাশের এলাকায় ইসলামের আলো বা ঈমানের আলো ছড়াবে। তারা নিজেকে আমার সমীপে ওয়াক্‌ফ করবে। আমার মতে এটা কোন অসম্ভব কাজ নয়। আমার মাথায় স্কীম এসেছে। এমন যুবকরা তাহরীকে জাদীদের আওতায় নয় বরং সরাসরি আমার সমীপে ওয়াকফ করবে। আমার নির্দেশ মত কাজ করবে। আমি মনে করি, আজ ধর্মের সেবায় এটি একটি বিরাট সুযোগ।

(দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৫৭)।

আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে বর্তমানে হাজার-হাজার ওয়াকফে জিন্দেগী ওয়াকফে জাদীদ তাহরীকের অধীনে কাজ করছেন। আর তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ধর্ম প্রচার, মসজিদ, মিশন হাউসসহ বিভিন্ন কাজ হচ্ছে। আর এসব সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অর্থের। ওয়াকফে জাদীদের বর্তমান বছরটি ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে। মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ খাতে বেশি বেশি আর্থিক কুরবানী করার পাশাপাশি নিজেদেরকে এই তাহরীকদ্বয়ে সম্পৃক্ত করে কুরআনী শিক্ষার আলোয় জীবন গড়ে সর্বদা অগ্রনী ভূমিকা রাখারও তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্রে

৩০ নভেম্বর, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১০
(২৯তম কিস্তি)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১২
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৬
(৩য় কিস্তি)
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

হুযূর (আই.)-এর কানাডা সফর-২০১৬ ২৯
পর্ব-১
মুকাররম আব্দুল মাজেদ তাহের

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ৩৩
কল্যানময় তাহরীক তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী
মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

কলমের জিহাদ ৩৬
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

পাঠক কলাম– "ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব" ৩৮

সংবাদ ৪১

এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা সম্প্রচারের ৪৭
ডিসেম্বর মাসের সময়সূচী

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۷۷﴾ ع

৭৭। আল্লাহ্ আরো দুজনের উদাহরণ দিচ্ছেন। এদের একজন বোবা, যার কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই এবং সে তার মনিবের ওপর বোঝা হয়ে আছে। সে তাকে যেখানেই পাঠায় সে তার জন্য কোন কল্যাণ (বার্তা) বয়ে আনে না। এ ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে, যে ন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং সরলসুদৃঢ় পথে (প্রতিষ্ঠিত[১৫৬৪]) রয়েছে?

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷۸﴾

৭৮। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের[১৫৬৫] অধিপতি আল্লাহ্ই। আর সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্তটি (আসার) বিষয় (তো) কেবল চোখের পলক ফেলার মত বরং এর চেয়েও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۹﴾

৭৯। আর আল্লাহ্ তোমাদের এমন অবস্থায় তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন[১৫৬৬] যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

১৫৬৪। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াতে দুই প্রকার কাফির দলের কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেই সকল কাফির সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধবিশ্বাস এবং পৌত্তলিক প্রথা ও অভ্যাসের দাসে পরিণত হয় এবং যদিও তারা কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার উপায় ও যোগ্যতার অধিকারী হয়, কিন্তু তাও করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। কারণ তারা কর্মের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং তারা অলসও। তফসীরাধীন আয়াতে সেইসব কাফির সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যারা শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাসের দাসই নয়, বরং তাদের মধ্যে বাস্তবে কোন ভাল কাজ করার আগ্রহ এবং যোগ্যতারও সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।

১৫৬৫। অদৃশ্য বিষয় বলতে কুফরীর অনিবার্য ও চরম পরাজয়, চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং ইসলামের বিজয়কে বুঝায়।

১৫৬৬। মানবের জ্ঞানার্জনে তার সাহায্যকারী বৃত্তিগুলোর ক্রমবিন্যাসের ধারায় শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, এবং উপলব্ধি শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এক নবজাত শিশু সর্বপ্রথম তার শ্রবণশক্তি ব্যবহার করে। পরবর্তীতে তার দর্শনশক্তির বিকাশ ঘটে এবং সবশেষে সে উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করে।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য

কুরআন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর তাঁর রসূলের এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (আনুগত্য কর)। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল। (আন্-নিসা ঃ ৬০ আয়াত)।

হাদীস ঃ

ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, **"প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার কর্মকর্তার আদেশ পালন করা আবশ্যকীয় যদিও বা তার (কর্মকর্তার) আদেশ ভালো লাগুক বা না লাগুক, তবে হ্যাঁ, যদি গুণাহ্ বা নাফরমানীর (খোদা ও রসূল সা.-এর হুকুম বিরোধী) আদেশ থাকে তবে তা পালন করা আবশ্যকীয় নয়"** (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের এক সুসভ্য ও সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে পরিণত হবার মূলমন্ত্র বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে, হে মুসলমানগণ! আনুগত্য করো, এর মাঝেই তোমাদের উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত।

উপরোক্ত হাদীস ইসলামী আনুগত্যের এক স্বর্ণালী শিক্ষার নীতি বর্ণনা করছে। ইসলাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ধর্ম। ইসলাম কাউকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণের শিক্ষা দেয় না। তবে যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাকে আনুগত্য ও সুশৃঙ্খল হবার আদেশ দেয় ও তাকে বলে তোমার জীবন এখন এক বিধি–বিধানের মধ্যে অতিবাহিত হতে হবে এবং এটাই ইসলামের ঐকান্তিক দাবী। ইসলামের শিক্ষা হলো শুন ও মানো। এ শিক্ষা দেয় না যে, যা ভালো লাগে তা মানো আর যা ভালো লাগে না তা মান্য করো না। হ্যাঁ, যদি কোন কর্মকর্তা শরীয়ত বিরোধী আদেশ দেয় তবে তা মান্য করা আবশ্যক নয়। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। যখন আত্মসমর্পণ করা হয়, তখন নিজের ইচ্ছা অথবা কোন শর্ত থাকে না। তাই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশকারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের উপর কর্মকর্তার নির্দেশ শুনা ও মান্য করা আবশ্যকীয়। এর মধ্যেই তোমরা শান্তি খুঁজে পাবে ও উন্নতি লাভ করবে। ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয় হলো সমস্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশকে মান্য করা হোক।

আজ ইসলামী বিশ্বে যে হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা তার মূল কারণ হলো যোগ্য নেতার অভাব ও যারা তথাকথিত নেতা হিসেবে আছেন তাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে খোদা ও রসূলের নাফরমানী। বিশ্বে আজ কেবল একটি জামাআত আছে যার নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাআত। এর সদস্যগণ এক নেতার অধীনে ওঠে আর বসে। পৃথিবীর ২০৯ টি দেশের আহমদীদের কান খাড়া থাকে খিলাফতের নির্দেশ শুনতে। যুগ-খলীফার কাছ থেকে যে আদেশ আসে তা পালন করতে তারা ব্রতী হয়ে আছে। খিলাফতে আহমদীয়ার কেয়ামতকাল অবধি টিকে থাকা নির্ভর করে আমাদের ঐকান্তিক আনুগত্যের উপর। খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি অগাধ আনুগত্যের ফলেই ২০০৮ সালে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত খিলাফতের শতবর্ষ জুবিলী উদযাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করার তৌফিক দিন। আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক গুণাবলী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদা তা'লার উচ্চ মর্যাদার মৌলিক গুণ চারটি। এই গুণগুলি হচ্ছে অন্য গুণাবলীর জননী– উম্মুস্ সেফাত। এবং প্রত্যেকটি গুণ আমাদের মানবীয়তা বা বাশারিয়্যত-এর কাছে এক চাহিদা রাখে। উক্ত চারটি গুণ হচ্ছে ঃ **রবুবিয়্যত, রহ্‌মানিয়্যত, রহীমিয়্যত এবং মালেকিয়্যত ইয়াওমেদ্দীন।**

(১) রবুবিয়্যত ঃ (প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্ব) ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করার জন্য নাস্তি (Nothingness)- অথবা নাস্তি-সদৃশ অবস্থার চাহিদা রাখে। এবং সৃষ্টির সমস্ত কিছুই – তা সে জড় হোক আর প্রাণী হোক – সবই এরই কারণে অস্তিত্ব লাভ করে।

(২) রহ্‌মানিয়্যত ঃ (অসীম ও অযাচিত দানশীলতা) ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণময়তা প্রকাশিত করার জন্য নিরংকুশ নাস্তির চাহিদা রাখে। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সেই নাস্তিত্বের– যার সময়ে অস্তিত্বের কোন প্রভাব ও প্রকাশ হবে না। এবং এর যে সম্পর্ক তা শুধু প্রাণিকুলের সঙ্গে, অন্য আর কিছুর সঙ্গে নয়।

(৩) 'রহীমিয়্যত' ঃ (বার বার প্রতিফল দানকারী পরম দয়াময়) ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণ সমূহ প্রকাশিত করার জন্য যুক্তি-বুদ্ধি সম্পন্নদের কাছ থেকে নাস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের একরার বা স্বীকৃতির চাহিদা রাখে এবং এ শুধু মানুষের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত।

(৪) 'মালিকে ইয়াওমেদ্দীন' ঃ (বিচার-দিবসের অধিপতি) ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করার জন্য অতি বিনীত প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতির চাহিদা রাখে। এই গুণ কেবল সেই সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যারা ভিখারীদের ন্যায় সেই এককত্বের (সেই এক খোদার) আস্তানায় লুটিয়ে পড়ে এবং কৃপা ও করুণা প্রাপ্তির আশায় সততা ও আন্তরিকতার আঁচল পেতে রাখে। এবং নিজেদেরকে খালি হাত অবস্থায় দেখেই তাঁর মালিকত্বের (মালিকিয়্যতের) প্রতি ঈমান আনে।

এই হচ্ছে সেই মৌলিক চারটি গুণ যা দুনিয়াতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এর মধ্যে রহীমিয়্যত-এর যে গুণ তা প্রার্থনা করতে বলে, এবং মালিকিয়্যত-এর গুণ ভয় ও ত্রাসের আগুনে দহন করে করে নির্মল বিনয়ের জন্ম দেয়। কেননা, এই গুণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, খোদা তা'লা পুরস্কার দান করার মালিক, এবং কারো কোন অধিকার বা হক্ক নেই যে, দাবী করেই সে কোন কিছু আদায় করে নিবে। এবং মাগফেরাতর ও নাজাত বা ক্ষমা ও পরিত্রাণও কেবল তাঁর ফযল বা অনুগ্রহেই সম্ভব'– (আইয়ামুস্ সুলেহ্ পৃ. ১৩-১৪)

[আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলী পুস্তক, পৃ. ২৮-২৯ থেকে উদ্ধৃত]

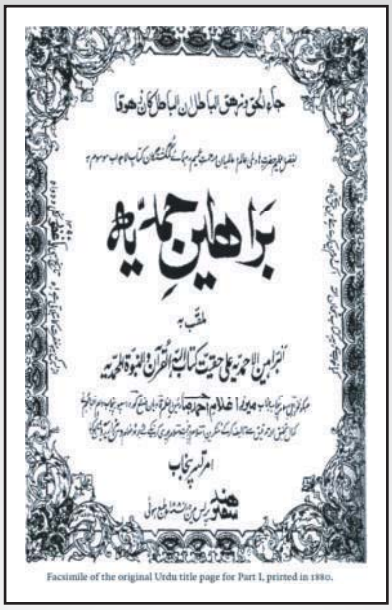

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২৫ তম কিস্তি)

অতএব এই পুরো গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অনন্যতার প্রকৃত অর্থ ও মাহাত্ম্য ঐশী কর্ম ও ঐশীবাণীরই বিশেষত্ব। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই জানে যে, খোদার ঈশ্বরত্ব মানার জন্য যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তা রয়েছে বুদ্ধি বা বিবেকের কাছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উৎসারিত প্রতিটি বিষয় অনন্যতার এমন স্তরে উপনীত যে, এক-অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্বেরই অকাট্য প্রমাণ দিবে। আর এ মাধ্যম যদি না থাকতো তাহলে বিবেক বা বুদ্ধির জন্য খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পথ রুদ্ধই থেকে যেত। আর খোদাকে চেনা যেখানে এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে, তাঁর পক্ষ থেকে যা কিছু রয়েছে, তাকে অনন্য ও অতুলনীয় বলে মেনে নাও! সেখানে একই বৈশিষ্ট্য যা খোদার নিরঙ্কুশ বৈশিষ্ট্য, বান্দাদের জন্যও তা প্রস্তাব করা বিবেক ও ঈমানেরই মূলোৎপাটনের নামান্তর।

অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা সাব্যস্ত হয় যে, বান্দার কোন কাজই অনন্য বা অতুলনীয় নয় পক্ষান্তরে খোদার সকল কাজ এবং যাকিছু তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তা সবই অতুলনীয়।

এমন নিখুঁত আরোহ যুক্তিতেও তোমাদের বিশ্বাস যদি না থাকে যা খোদার সমূহ প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে; তাহলে যুক্তি-বুদ্ধি বা প্রকৃতির নিয়মের কথা আর মুখেই এনো না, বরং যুক্তি ও দর্শনের অকেজো গ্রন্থাবলী ছিঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দাও। একটি মাছি যা দেখতেও রুচি হয় না, স্বীয় বাহ্যিক আকৃতি ও আভ্যন্তরীন গঠণ-বিন্যাসে তা এতটা অনন্য যে, এর ওপর দৃষ্টিপাতে খোদার পক্ষ থেকে এর সৃষ্টি হওয়া সপ্রমাণিত। কিন্তু খোদার বাণী বা উক্তির বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতা কি এতটা অতুলনীয় ও অনন্যও হতে পারে না, যার ওপর দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হবে যে, সেই বাণী বা গ্রন্থ খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত! এর অন্যথা ভাবতে তোমাদের কী লজ্জাও হয় না? হে উদাসীনরা! হে বিবেক-

বুদ্ধিহীনরা! খোদার বাণীর বাগ্মিতা কি মাছির ডানা ও পা থেকেও নিম্নমানের এবং গুণগত মানে নিতান্তই তুচ্ছ ?

কতই না পরিতাপের বিষয়! একটি মাছির সৃষ্টি-শৈলী সম্পর্কে তোমরা পরিস্কারভাবে স্বীকার কর যে, এমন গঠন-গড়ন প্রদান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না; অথচ ঐশী বাণী বা ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে বল যে, তা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে! বরং বিতর্ক ও বিতন্ডার ছলে এই যুক্তি দেখাও যে, যদিও এ পর্যন্ত কোন মানুষ এটি বানাতে সক্ষম হয়নি কিন্তু এ কথার কি প্রমাণ আছে যে ভবিষ্যতেও পারবে না?

হে নির্বোধরা! এর প্রমাণ তাই, তোমরা মশা-মাছি এবং বৃক্ষের পাতায় পাতায় পরিস্কারভাবে যা লক্ষ্য কর এবং স্বীকার কর,কিন্তু এই ঐশী জ্যোতি দেখতে গিয়ে তোমাদের চোখ পেঁচার ন্যায় অন্ধ বা ঝাপসা হয়ে যায়। তাই তোমরা মাছির স্বভাবের বশবর্তী হয়ে মাছিরই মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী, খোদার জ্যোতিতে নয়। যেসব শব্দ সম্পর্কে বলা হয়, এগুলো স্বীয় অর্থসহ খোদার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, সেগুলোকে তোমরা সেই লালার মতও মনে কর না যা মৌমাছির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুসারে মানুষ মধু তৈরীর শক্তি রাখে না ঠিকই কিন্তু খোদার কথা বা ঐশীবাণী বানানোর শক্তি রাখে! অর্থাৎ তোমাদের কাছে পোকা-মাকড় এতটাই মন:পূত ও পছন্দ হয়ে গেল যে, খোদার উক্তি এসবেরও সমপর্যায়ের নয়। হে অজ্ঞরা! খোদার বাণী অনন্য যদি না-ই হয় তাহলে কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষের পত্রপল্লবের অনন্য হওয়ার সংবাদ তোমাদের কাছে কোথা থেকে পৌঁছুলো? তোমরা আদৌ চিন্তা-ভাবনা কর না যে, ঐশী বাণীর বিন্যাস ও গঠনে একটি কীটের দেহাবয়ব বিন্যাসের ন্যায় উৎকর্ষতাও যদি না থাকে তাহলে এটি খোদারই বিরুদ্ধে আপত্তির নামান্তর। অর্থাৎ তিনি (দুনিয়ার দৃষ্টিতে) যেন তুচ্ছকে উচ্চের বা অধমকে উত্তমের চেয়ে বেশি সম্মান দিলেন আর তুচ্ছের হাতে স্বীয় সত্তার বিরুদ্ধে সেই প্রমাণ তুলে দিলেন যা উচ্চকে দান করেননি।

কুরআনের সৌন্দর্য ও সুষমা সকল মুসলমানের প্রাণের জ্যোতি। অন্যদের চাঁদ হলো চন্দ্র, কিন্তু আমাদের চাঁদ হলো কুরআন।

আমরা চিন্তা করে দেখেছি কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আমরা এর কোন জুড়ি খুঁজে পাই না

আর তা অনন্য কেনই বা হবে না, কারণ এটিতো রহমান খোদার বাণী

এর প্রতিটি বাক্যে চিরস্থায়ী বসন্ত বিরাজমান। সেই গুণ উদ্যানেও নেই এবং এর মত কোন বাগানও নেই।

খোদার পবিত্র বাণীর আদৌ কোন সমকক্ষ নেই, হোক না তা ওমানের মুক্তো আর বাদাখশাহ্'-এর মণি-মাণিক্য।

মানুষের উক্তি, কীভাবে খোদার কথার সমান হতে পারে? সেখানে রয়েছে শক্তিমত্তা আর এখানে দুর্বলতা– দু'য়ের পার্থক্য অতি স্পষ্ট।

ফিরিশতা যার সন্নিধানে অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে, সেখানে কথায় তাঁর সমকক্ষতা অর্জন মানুষের পক্ষে কী করে সম্ভব হতে পারে?

মানুষ যেখানে কোনভাবেই কীট-পতঙ্গের একটি পা পর্যন্ত বানাতে সক্ষম নয়, সেখানে সত্যের জ্যোতি বানানো তার জন্য কী করে সম্ভব হতে পারে?

হে মানুষ, খোদার মাহাত্ম্যের প্রতি কিছুটা হলেও শ্রদ্ধাশীল হও, যৎকিঞ্চিত ঈমানও যদি থাকে তাহলে এখনও সময় আছে মুখ সামলাও,

অন্যদেরকে খোদার সমকক্ষ বানানো ভয়াবহ কুফরী। হে বন্ধুগণ, খোদাকে কিছুটা হলেও ভয় কর। মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপ করা -এটি কেমন বিচার?

যদি খোদার এক ও অদ্বিতীয় সত্তাকে মেনে থাক তাহলে তোমাদের হৃদয়ে কেন এত প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান?

তোমাদের হৃদয়ে অজ্ঞতার এ কেমন পর্দা পড়ল? তোমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত, বিরত হও, যদি কিছুটা খোদাভীতি থাকে।

আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ নেই, এটি বিনয়াবনত সদুপদেশ মাত্র।যদি কেউ পবিত্রমনা হয়ে থাকে তাহলে আমার অন্তরাত্মা তার জন্য নিবেদিত।

এ পর্যন্ত ঐশী বাণী বা কুরআনের অনন্যতা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা এ যুগের দুর্বল বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও অতি-স্বাধীন মুসলমানদের জন্য বর্ণিত হয়েছে যাদেরকে ইংরেজীর সোফিস্ট দর্শন (যারা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে না বা যারা সত্যকে আপেক্ষিক গণ্য করে) ও প্রতারণামূলক শিক্ষা দাম্ভিক ও অন্তর্দৃষ্টিহীন করে পবিত্র কুরআন যে অনন্য ও অতুলনীয় এবং এর খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারে প্রবৃত্ত করেছে আর যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, পবিত্র কুরআনে ঈমান এনে এবং কলেমা পড়ার ভান করে অবিশ্বাসীদের ন্যায় আল্লাহ্‌র বাণীকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক তুচ্ছ মানুষের কথার মত মনে করে বসে আছে এরা আয়াত

ওয়ামা কাদারুল্লাহা হাক্কা কাদরিহী

সত্যায়নস্থল হয়ে খোদার মহাক্ষমতা এবং প্রজ্ঞাসমূহকে ভুলিয়ে দিয়েছে, যা দেখার জন্য খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বা উৎসারিত প্রতিটি বস্তু খোদা-দর্শনের আয়নাস্বরূপ হওয়া উচিত।

কিন্তু এসব সত্য এত প্রদীপ্ত ও স্বচ্ছ যে, কোন ব্যক্তি মুসলমানদের জামাতভুক্ত না হলেও সার্বিক অর্থের নিরিখে সেও বুঝতে পারে। যে বাণীকে, আল্লাহ্‌র বাণী বলা হবে এর অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া আবশ্যক কেননা; সকল বিবেকবান ব্যক্তি খোদার প্রকৃতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করে এবং সকল বস্তু যা তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তাকে সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ও মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে দেখে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোন বস্তু যা খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত, তা এমন নয় যার নযীর মানুষ উপস্থাপনে সক্ষম হবে। এছাড়া কোন বিবেকবানের বোধ-বুদ্ধিও এ কথা প্রস্তাব করতে পারে না যে, খোদার সত্তা বা তাঁর গুণাবলী অথবা তাঁর কর্মে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব বৈধ।

উল্লেখিত প্রমাণাদি ছাড়াও আরও অনেক দিক আছে যার মাধ্যমে খোদার বাণীর অনন্য হওয়া আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই প্রমাণগুলোর একটি, সেই ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল থেকে গ্রহণ করা হয় যা কাজের সময় ভিন্নভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, সকল বিবেকবানের কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কয়েকজন পন্ডিত ও সুলেখক, স্ব-স্ব জ্ঞানগত যোগ্যতার জোরে যখন এমন এক প্রবন্ধ লিখতে যাবে যা অত্যুক্তি, মিথ্যাচার, অপ্রয়োজনীয় কথা, বাজে-হাস্যষ্কর এবং অর্থহীন ও আগোছালো ভাষা এবং প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার সকল পথে অন্তরায়, এমন সব বিষয় হতে অধিকন্তু এমনসব বিপত্তি হতেও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক যা সম্পূর্ণতা ও ঔৎকর্ষের পরিপন্থী। একই সাথে তা যদি শতভাগ সত্য, প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, আলঙ্কারিকতায় এবং সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে তাহলে এমন বিষয়াবলী লিখতে সে ব্যক্তিই সর্বাগ্রে থাকবে; জ্ঞানগত শক্তি, জ্ঞানের ব্যাপ্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানে যে সবার উপরে, আর প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ লেখার দক্ষতা ও অনুশীলনে যে থাকবে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে।

সামর্থ, জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতা, মেধা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে যে তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের, তার জন্য রচনার শ্রেষ্ঠত্বে সে ব্যক্তির সমকক্ষ হওয়া কখনও সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক দক্ষ চিকিৎসক যে চিকিৎসা শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা রাখে, দীর্ঘদিন অনুশীলনের কারণে যে রোগ নির্ণয় ও রোগ-ব্যাধির গবেষণায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখে, এছাড়া বক্তৃতা বা ভাষায় অনন্য আর গদ্য-পদ্য লেখায়ও সমসাময়িক যুগে সবার চেয়ে অগ্রগামী; সেই ডাক্তার কোন রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রকৃতি, এর লক্ষণাবলী ও কারণগুলো যেরূপ ও যতটা বাগ্মিতাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী করে অত্যন্ত সঠিক, সত্য, দৃঢ় ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতে পারে,এক ব্যক্তি যার চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদৌ কোন জ্ঞান নেই আর বক্তৃতা বা ভাষাশৈলী সম্পর্কেও যে পুরোপুরী অনবহিত; সেও প্রথমোক্ত চিকিৎসকের ন্যায় বর্ণনা করবে–এটি অসম্ভব! এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, অজ্ঞ আর জ্ঞানীর বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছুটা হলেও পার্থক্য থেকেই থাকে।

মানুষ যতটা জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, তা তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় অবশ্যই সেভাবে প্রতিফলিত হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়, যেভাবে একটি পরিস্কার আয়নায় চেহারা দেখা যায়, আর সত্য ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ বিষয় বর্ণনার সময় তার মুখ থেকে যেসব কথা বের হয় তা তার জ্ঞানের গভীরতা যাচাইয়ের জন্য একটি মাপকাঠি বলে গণ্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু যুগপৎ জ্ঞানের ব্যাপকতা ও বুদ্ধির সর্বোচ্চ প্রস্রবণ হতে উৎসারিত কথা আর সংকীর্ণ, বিমর্ষ, তমসাচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণাপ্রসূত কথার মাঝে পার্থক্য সেভাবে স্পষ্ট, যেরূপ ঘ্রাণ-শক্তির সামনে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে থাকে–অবশ্য কোন স্বভাবগত বা সাময়িক রোগব্যাধির কারণে ঘ্রাণশক্তি যদি লোপ না পেয়ে থাকে!

তোমরা যতটা পার চিন্তা করে দেখ, যত ইচ্ছা প্রণিধান কর, এই সত্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না আর কোন দিক থেকে এতে কোন বিপত্তি খুঁজে পাবে না।

অতএব সকল দিক থেকে যেখানে প্রমাণিত যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিগত শক্তির মাঝে যে পার্থক্য প্রচ্ছন্ন থাকে অবশ্যই তা কথা বা বাণীতে প্রকাশ পেয়ে যায়। এছাড়া যারা যুক্তি ও জ্ঞানে প্রাগ্রসর (শ্রেষ্ঠ) ও মহান; তারা বক্তৃতার বাগ্মিতায় ও বাক্য অলঙ্করণের শ্রেষ্ঠত্বে অন্যদের সমান হয়ে যাবে আর আভ্যন্তরীণ কোন পার্থক্য থাকবে না –এটি সম্ভব নয়। অতএব এই সত্য প্রমাণিত হওয়া সেই দ্বিতীয় সত্যের সত্যতার প্রমাণের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ যে বাণী বা গ্রন্থ খোদার বাণী, মানবীয় কথার সাথে স্বীয় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতায় এর শ্রেয়তর, মহান ও অনন্য হওয়া আবশ্যক। কেননা কারো জ্ঞানই খোদার সম্পূর্ণ-সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানের সমান হতে পারে না। আর এদিকেই ইঙ্গিত করে খোদা বলেছেন,

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ

[সূরা হুদ, ১১:১৫]

অর্থাৎ কাফিররা যদি এই কুরআনের মত কিছু উপস্থাপন করতে না পারে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে ব্যর্থ হয় তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, এই বাণী মানবীয় জ্ঞান হতে উৎসারিত নয়, বরং খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যার ব্যাপক ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের সম্মুখে মানবীয় জ্ঞান অন্তঃসারশূণ্য ও তুচ্ছ।

এই আয়াতে আরোহ যুক্তির আদলে 'প্রভাবের অস্তিত্ব'-কে 'প্রভাব বিস্তারকারীর অস্তিত্ব'-এর প্রমাণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে অন্য ভাষায় সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, খোদার জ্ঞান আপন শ্রেষ্ঠত্ব (পরাকাষ্ঠা) ও উৎকর্ষতার মানদণ্ডে মানুষের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের সদৃশ মোটেও হতে পারে না। বরং যে বাণী সেই শ্রেষ্ঠ ও অনন্য জ্ঞান হতে উদ্ভূত তারও শ্রেষ্ঠ ও অনন্য হওয়া আবশ্যক আর মানুষের কথা হতে এর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। অতএব, এই শ্রেষ্ঠত্বই পবিত্র কুরআনে প্রমাণিত।

মোটকথা, খোদার বাণীর সাথে মানুষের উক্তির পার্থক্য এতটা স্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি কি-না খোদা ও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। যেভাবে মানব প্রজন্মের প্রত্যেক ব্যক্তি একই শ্রেণীভুক্ত হয়েও জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের পার্থক্যের কারণে বক্তৃতা ও কথার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে, ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ও দৃঢ়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের উন্নত চিন্তাভাবনার স্তরে কোন সীমিত জ্ঞান ও স্বল্পবুদ্ধির মানুষ যেখানে আদৌ পৌঁছুতে পারে না, সেখানে খোদা, যিনি কারো সাথে শ্রেণীগত সাদৃশ্যের সম্পূর্ণভাবে উর্ধ্বে আর নিঃসন্দেহে পরম শ্রেষ্ঠত্বসমূহের সমাহার অধিকন্তু স্বীয় সকল গুণাবলীতে যিনি এক-অদ্বিতীয়, সেখানে কারও তাঁর সমকক্ষ হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও কীভাবে থাকতে পারে? আর সৃষ্টি হয়ে কীভাবে কেউ নিজের তুচ্ছ গুরুত্বহীন জ্ঞানকে স্রষ্টার অনন্ত-অসীম জ্ঞানের যে বাণী বা গ্রন্থ-এর সমান ভাবতে পারে? এই সত্যতা প্রমাণে এখনও কোন ঘাটতি রয়ে গেছে কী যে, সকল বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান ও কর্মশক্তির অধীনস্থ? এমন কোন মানুষও আছে কি যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আংশিকভাবে হলেও এই সত্যকে

দেখেনি? অতএব এ সত্য অনুধাবন যেখানে এতটা শক্তিশালী ও দৃঢ় এবং এত সুপ্রচারিত ও সুবিদিত সেখানে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যে পর্যায়েরই হোক না কেন সে তা বুঝতে অপারগ বা অক্ষম নয়।

এমন পরিস্থিতিতে চরম নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে দুর্বল মানবের মাঝে এই সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তার পবিত্র বাণীর সত্যতা গ্রহণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে যার স্বীয় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় অতুলনীয় ও অনন্য হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। কোন কোন ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তি এ যুক্তিও দিয়ে থাকে যে, যদিও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিই আবশ্যক মনে হয় যে, খোদার বাণী অনন্য বা অতুলনীয় হওয়া উচিত কিন্তু এমন বাণী কোথায়, যার অনন্য হওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? যদি কুরআন অনন্য হয়ে থাকে তাহলে এর অনন্যতা স্পষ্ট কোন প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। কেননা এর অনন্য বাগ্মিতা সম্পর্কে কেবল সেই ব্যক্তিই অবহিত হতে পারে যার মাতৃভাষা হলো আরবী। তাই সাধারণভাবে মানুষের সামনে এর অনন্যতা কোনভাবেই প্রমাণগণ্য হতে পারে না আর তারা এটি থেকে লাভবানও হতে পারে না। এর উত্তরে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বৃথা এই আপত্তি তাদের, যারা কুরআনের অনন্যতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে জানার জন্য আন্তরিকভাবে কখনও এদিকে মনোযোগই দেয়নি বরং কুরআনের আলো দেখে অন্যত্র মুখ ফিরিয়ে রেখেছে; পাছে এই আলোর কোন ক্ষীণ প্রতিবিম্ব না তাদের ওপর এসে পড়ে।

নতুবা পবিত্র কুরআনের অনন্যতা সত্য-সন্ধানীদের জন্য এতটাই সুপ্রকাশিত ও সমুজ্জ্বল যে তা সূর্যের মত স্বীয় কিরণ চতুর্দিকে বিস্তৃত করে চলছে আর যা অনুধাবন করা ও জানার পথে অন্তরায় বা সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যদি বিদ্বেষ ও শত্রুতার অমানিশা আড়াল সৃষ্টি না করে, তাহলে সামান্য মনোযোগেই সেই উৎকর্ষ জ্যোতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। এটি সত্য কথা যে, পবিত্র কুরআনের অনন্যতার কিছু দিক বা যুক্তি এমন আছে যা জানার জন্য আরবী ভাষার কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এ কথা মনে করা চরম অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি যে, কুরআনের নিদর্শনকে বোঝা ও অনুধাবন করা পুরোটাই আরবী জানার ওপর নির্ভরশীল বা কুরআনের সকল বিস্ময়াবলী ও সকল মহান বৈশিষ্ট্য কেবল আরবদের সামনেই উন্মোচিত হতে পারে; অন্যদের জন্য তা উদঘটানের সকল পথই রুদ্ধ। মোটেই নয়, আদৌ নয়। সকল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে, কুরআনের অনন্যতার কারণগুলোর বেশীরভাগ এত সহজ ও দ্রুত বোধগম্য যে, তা জানা ও অবগত হওয়ার জন্য আরবীর দক্ষতার আদৌ প্রয়োজন নেই বরং এসব এতটা স্পষ্ট ও পরিস্কার যে, মানুষ আখ্যা পাওয়ার জন্য সামান্যতম যে বিবেক-বুদ্ধিটুকু দরকার, তা বোঝার জন্য ততটুকুই যথেষ্ট।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সবিনয় নিবেদন

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, ইশায়াত (প্রকাশনা) বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জামাতের সদস্যদের জন্য ধার নিয়ে জামাতী বই-পুস্তক পড়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যেসব জামাতে লাইব্রেরী রয়েছে অথবা যেখানে লাইব্রেরী নেই তারাও আমাদের কাছ থেকে লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে বই নিতে পারবেন। আপনাদের আবেদনের ভিত্তিতে আমরা বই পাঠাব, ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত বইগুলিতে কার্ড হোল্ডার লাগানো থাকবে এবং কার্ডের একটি অংশে পাঠকদের নাম অন্তর্ভূক্তকরণেরও ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় জামাতের দায়িত্ব হবে কোন একজন দায়িত্ববান সদস্যকে একাজের জন্য নিযুক্ত করা যিনি পাঠকের বই গ্রহণের তারিখ এবং ফেরত দেবার তারিখ সেখানে লিপিবদ্ধ করবেন। এভাবে আপনারা নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পাঠ করতে পারবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইসহ জামাতের বিভিন্ন খলীফাদের বই, অন্যান্য লেখকদের বইও আপনারা এভাবে আনিয়ে নিয়ে জামাতের সদস্যদের মাঝে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। এ মর্মে জামাতের সকল সদস্যদের নিকট সবিনয় আবেদন, আপনারা পুণ্য অর্জনের খাতিরে এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন কেননা আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর মাঝে একটি হল জ্ঞান অর্জন করা।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে বেশী বেশী ধর্মীয় বই-পুস্তক অধ্যয়ন করার সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

বিনীত নিবেদক
মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২৯তম কিস্তি)

এখন সুনিশ্চিত অনুধাবন করুন যে, ইবনে-মরিয়ম দু'জন ফিরিশ্‌তার কাঁধে ভর করে দামেস্কের পূর্ব দিকে মিনারার কাছে অবতীর্ণ হবেন বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেটিরও একই অবস্থা। কেননা যদি অবিকল সেভাবেই এ ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ওরূপ দৃশ্যমানভাবে মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে পৃথিবীবাসীর মাঝে কেই-বা অস্বীকার করতে পারে? তাদের মাঝে কি কোনো কাফির বা অবিশ্বাসী থাকতে পারে? দুনিয়া জুড়ে এখন যেসব জাতি বাস করে তারা ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান, হিন্দু কি বৌদ্ধ বা তারকা পূজারী মোট কথা, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, প্রকাশ্যভাবে কোনো নবীকে আকাশ থেকে আপনারা যদি নামতে দেখতে পান আপনারা কি তা সত্ত্বেও তাঁর নবুওয়ত ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করতে থাকবেন? নিঃসন্দেহে সব জাতির মানুষ এ উত্তরই দেবে, 'আমরা যদি ফিরিশ্‌তাদের কাঁধে হাত রেখে সে বুযূর্গকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখতে পাই তাহলে নিঃসন্দেহে ঈমান আনবো।' অথচ আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কুরআন করীমে বলেনঃ **'ইয়া হাস্‌রাতান আলাল্ ইবাদ মা ইয়া'তিহিম মির্ রাসূলিন ইল্লা কানূ বিহি ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন'** অর্থাৎ 'আক্ষেপ সেই বান্দাদের প্রতি যাদের কাছে এমন কোনো নবী আসে না যাকে নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রুপ করে না।'

অনুরূপভাবে কুরআন করীমের বহু জায়গায় লেখা আছে, এমন কোনো নবী আসেন নি যাঁকে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মেনে নিয়েছে। এখন যদি হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে সত্যিসত্যি সেভাবেই (আকাশ থেকে) নেমে আসতে হয় যেভাবে উলামা বিশ্বাস করে বসেছেন, তাহলে এতে করে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে কোনো একটি মানুষও অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের উলামাদের স্মরণ রাখা উচিত, এমনটি কখনও ঘটেনি এবং কখনও ঘটবে না। কেননা খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেন, 'আমি যদি ফিরিশ্‌তাদেরও পৃথিবীতে নবী নিযুক্ত করে পাঠাতাম তাহলে তাদের ব্যাপারেও সংশয়াপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকতো।' অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রেও সংশয় ও সন্দেহ করার জায়গা বাকি থাকে। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার মু'জিযা দেখানোর এ দাবীই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমীপেও জানানো হয়েছিল। আর তখন এই মু'জিযা প্রদর্শনের প্রয়োজনও খুব বেশী ছিল। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালত অস্বীকার করায় চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা এ মু'জিযা দেখান নি। বরং প্রশ্নকারীদের সাফ জবাব দেয়া হয় যে, এ 'দারুল-ইব্‌তিলা' বা পরীক্ষাগার তুল্য ভূবনে খোদা তা'লা প্রকাশ্য ও খোলাখুলি মু'জিযা কখনও দেখান না, যাতে 'ঈমান-বিল-গাইব' তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধানটিতে ব্যতিক্রম না ঘটে। কেননা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোনো বান্দা বা ফিরিশ্‌তাকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখা গেলে তো ঈমানের পরীক্ষামূলক বিষয়টির সার্বিকভাবে মীমাংসাই হয়ে গেল, কোনো পর্দাই আর থাকলো না। তখন অস্বীকারকারী কোনো হতভাগা ব্যক্তিও থাকবে না। অথচ কুরআন করীম এমন সব আয়াতে ভরপুর রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, ওই রকম খুলাখোলিভাবে মু'জিযা দেখানো খোদা তা'লার রীতি নয়! বস্তুত মক্কাবাসী কাফিররা সর্বদা এরূপ মু'জিযা দেখাবার জন্যই দাবী জানাতো। আর খোদা তা'লা তাদের বলতেন, 'আমরা চাইলে, আকাশ থেকে এমন কোন দিনর্শন অবতীর্ণ করতে পারি, যার দরুন সকল কাফির ও অস্বীকারকারীর মাথা নত হয়ে যায়। কিন্তু এই পরীক্ষাগারে এরূপ নিদর্শন দেখানোর আমাদের রীতি নেই। কেননা এতে 'ঈমান-বিল-গাইব'– অদৃশ্যে বিশ্বাস (এর বিধান) বিনষ্ট ও তিরোহিত হয়, যার ভিত্তিতে সব সওয়াব ও সুফল নির্ধারিত ও বিন্যস্ত হয়ে থাকে। অতএব হে ভ্রাতাগণ! কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে

একান্তই হিতাকঙ্খাস্বরূপ আপনাদের বোঝাতে চাই যে এই অলীক ধ্যান-ধারণা থেকে নিবৃত্ত হোন এবং নিম্নোক্ত কারণ দু'টির প্রতি গভীর মনোনিবেশে দৃষ্টিপাত করুন। এ দু'টি বিষয় যে কত জোরালো ও দৃশ্যমান! প্রথমত, এলিয়া নবীর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ তিনি যে অবতীর্ণ হলেন তো কীভাবে অবতীর্ণ হলেন। দ্বিতীয়ত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনেও এ প্রশ্নটির উপস্থাপন এবং **'কুল সুবাহানা রাব্বি'** (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪) আয়াতটিতে এর উত্তর প্রদান। গভীর মনোনিবেশে চিন্তা করুন, এ আয়াতটি কি এ বিষয়টি বোঝাবার জন্য অতি জোরালো যুক্তি ও পর্যাপ্ত প্রমাণস্বরূপ নয়? এতে কি বোঝা যায় না যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বলতে আক্ষরিক অর্থে বাহ্যিক আকারে অবতীর্ণ হওয়া বোঝায় না বরং রূপকার্থে প্রতিবিম্বাকারে অবতীর্ণ হওয়া বোঝায়? আবহমান কাল থেকে আজ পর্যন্ত পূত-পবিত্র ব্যক্তিগণ এভাবেই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে এসেছেন এবং উপমামূলক ও রূপক ভাষায় সর্বদা এটাই বলে এসেছেন যে, 'ইনি দ্বিতীয় আদম এসেছেন, ইনি দ্বিতীয় ইউসুফ এসেছেন বা ইনি দ্বিতীয় ইব্রাহীম এসেছেন'। কিন্তু মাটির দেহসহ কোনো আদম-সন্তানকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে এখন পর্যন্ত কেউ দেখেনি। অতএব যে বিষয়টি বিশ্ব জুড়ে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার রীতি-নীতি বিরোধী এবং প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী, বিরূপ ও বিপক্ষে এবং ঘটমান ও দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার বিপরীত বলে স্বতঃসাব্যস্ত সেটি মানার জন্য কেবল 'যয়ীফ' (দুর্বল), পরস্পর বিরোধী, সংকীর্ণ অর্থবোধক ও দুর্বোদ্ধ রিওয়ায়াতগুলোর দ্বারা কাজ চালানো যায় না। অতএব আপনারা এমনটি প্রত্যাশা করবেন না যে সত্যিসত্যি ও বাস্তবত জগৎজুড়ে সবার দৃষ্টিপথে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে আকাশ থেকে ফিরিশ্‌তাগণসহ অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। যদি এ শর্তসাপেক্ষেই উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ঈমান আনতে হয় তাহলে এর প্রকৃতস্বরূপ সবার জানা, তিনি কখনো আকাশ থেকে ওভাবে নামবেন না এবং আপনাদের ঈমান আনাও হবে না। এমন না হোক যে, কোনো বেলুনে আরোহনকারী এবং আপনাদের সামনে অবতরণকারীর সম্পর্কে আপনারা আবার ধোকায় পড়ে যান। অতএব সাবধান থাকুন, ভবিষ্যতে আপনাদের এসব বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার কারণে এরকম কোনো অবতরণকারীকে ইবনে-মরিয়ম মনে করে বসবেন না! এটি নিয়মের ও একটি নীতিগত কথা, যে-ব্যক্তি সত্যকে অগ্রাহ্য করে তাকে আবার অন্য সময়ে মিথ্যা গ্রহণ করতে হয়। অতএব যে-সব দুরাত্মা ও হতভাগা লোক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অগ্রাহ্য করেছিল তারা অচিরে মুসাইলামা কায্‌যাবকে গ্রহণ করে, এমনকি ছয়-সাত সপ্তাহের মধ্যেই তাদের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায় যারা সবাই তার প্রতি ঈমান আনে।

অতএব খোদা তা'লাকে ভয় করুন এবং পৃথক পৃথক ভাবে নিভৃতে বসে চিন্তা-ভাবনা করুন, এখন পর্যন্ত ঐশী রীতি-নীতি কী ধারায় চলে এসেছে। আর এ-ও ভেবে দেখুন, সহীহ্ হাদীসসমূহে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কোথাও উল্লেখ নেই। শুধু 'নাযালা' (সে অবতীর্ণ হলো) বা 'ইয়ানযিলু' (সে অবতীর্ণ হয় বা হবে) শব্দদ্বয় আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ দেয় না। ধরে নিন, যদি 'আকাশ' শব্দও থাকতো তবুও তা আমার উদ্দেশ্য বা পেশকৃত অর্থের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ বা কোনো ব্যত্যয় ঘটায় না। কেননা তওরাত ও ইঞ্জিলেও এ রকম সূত্র বা শ্লোক বহুল সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় যেগুলোতে নবীদের সম্পর্কে লিখা আছে যে তাঁরা আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। যেমন, ইউহান্নার ইঞ্জিলে হযরত ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে তাঁর এই উক্তিটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের দিক দিয়ে আসে সে পার্থিব হয়ে থাকে এবং পার্থিব কথা বলে। আর যে আকাশ থেকে আসেন তার অবস্থান সবার ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ নবীদের বাণী অপরাপর বুদ্ধিমানদের উক্তির চেয়ে অগ্রগণ্য, কেননা নবী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন)'। দেখুন ইউহান্না, অধ্যায়ঃ ৩, শ্লোক ঃ ৩১। অতঃপর দ্বিতীয় উক্তিটি হলো ঃ 'আমি আকাশ থেকে এজন্য অবতীর্ণ হইনি যে নিজের ইচ্ছামত চলি (বা স্বচ্ছচারিতা করি)।' (ইউহান্না, অধ্যায় ঃ ৬, শ্লোক ১১)। এরপর তৃতীয় উক্তিটি হলো ঃ 'যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে ছাড়া কেউ আকাশে যায়নি' (ইউহান্না, অধ্যায় ঃ ৩ শ্লোক ১৩)। 'আমরা অবতীর্ণ করেছি' অথবা 'এটি অবতীর্ণ হয়েছে' এ কথাটির কখনও এ অর্থ নয় যে, একে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কেননা কুরআন করীমে এ-ও বলা হয়েছে ঃ 'আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি।' 'গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছি।'*

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

---

* টীকা ঃ আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

(১) "ওয়া আনযালনাল হাদীদা"– অর্থাৎ 'আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি' (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)।

(২) "কাদ আনযালনা আলাইকুম লিবাসান" অর্থাৎ 'আমরা তোমাদের ওপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি'। (সূরা আ'রাফ ঃ ২৭৯)।

(৩) "ওয়া আনযালা লাকুম মিনাল আনআম" অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছেন' (সূরা যুমার ঃ ৭)।

তেমনিভাবে তৌরাতে এই বাক্যগুলো রয়েছে ঃ (১) 'মরু প্রান্তরে আমাদের অবতীর্ণ হওয়া (গণনা, অধ্যায় ঃ ১০, শ্লোক ৩১) (২) 'আমাকে জর্দানের পাড়ে অবতীর্ণ হতে হবে।' (২য় বিবরণ ঃ অধ্যায় ঃ ৪ শ্লোক ঃ ২২)। (৩) 'আমার অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা আছে'- (পয়দায়েশ ঃ ২৩, ২৪)।

এখন এই সকল আয়াত ও শ্লোক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'অবতীর্ণ হওয়া' বলায় 'আকাশ থেকে নেমে আসা' কখনও বোঝায় না এবং 'অবতীর্ণ হওয়া'র সঙ্গে আকাশ শব্দ যোগ করা এমন নয় যেমন কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'দুই আর দুইয়ে কত হয়?' তবে সে উত্তর দেয় ঃ চারটি রুটি।' –প্রণেতা

জুমুআর খুতবা

ইতালীতে পর্বতারোহণ অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী যুক্তরাজ্য জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র স্নেহভাজন রেযা সেলীম দুর্ঘটনার কবলে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করায় মরহুমের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

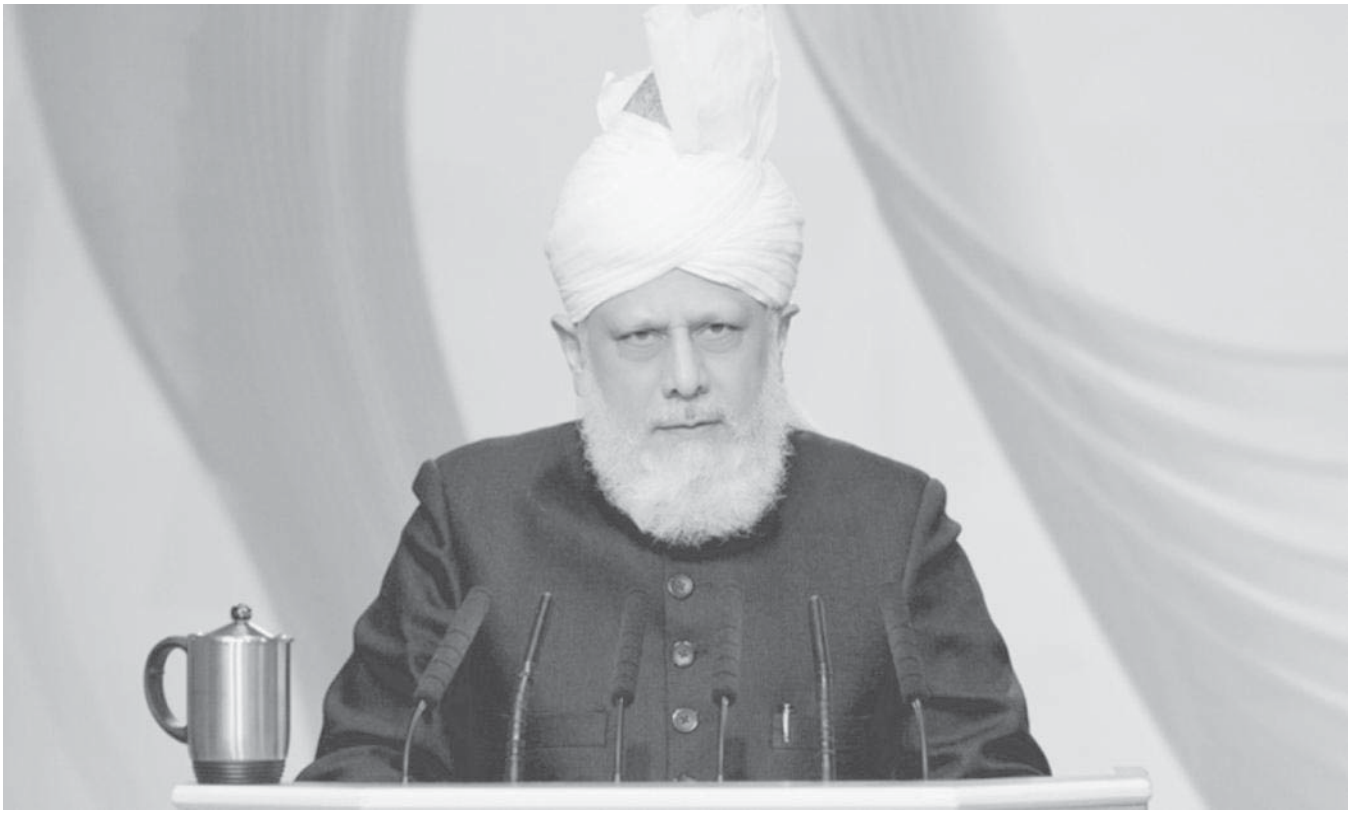

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষেরই একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। বরং কোন কিছুই স্থায়ী নয়। কতক একান্ত শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আর কতক যৌবনে, কেউ বৃদ্ধ বয়সে বা কেউ চরম বার্ধক্যে পৌঁছায়, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে أَرْذَلِ الْعُمُرِ আখ্যা দিয়েছেন আর সেই বয়সে পৌঁছে মানুষ পুনরায় শৈশবের পরমুখাপেক্ষিতা এবং জ্ঞানহীনতার শিকার হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। প্রত্যেক প্রয়াত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়-স্বজন, কাছের আপন মানুষের

বিদায়ে শোকাভিভূত হয়, তা বিদায় সে যে বয়সেই নিক। তবে কিছু সত্তা বা কতক ব্যক্তিত্ব এমন হয়ে থাকে, এই পৃথিবী থেকে যাদের বিদায় নেয়া এবং ইন্তেকালে শোক এবং দুঃখে জর্জরিত মানুষের গন্ডী অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে। আর এমন কোন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যদি যৌবনে আকস্মিকভাবে ইহজগত থেকে বিদায় নেয় তাহলে দুঃখ-বেদনা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদেরকে প্রতিটি কষ্ট আর সমস্যায় এবং আক্ষেপ ও দুঃখ-বেদনাকালে খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার জন্য **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন**-এর দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ আমরা খোদা তা'লারই, আর তাঁরই পানে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আর পৃথিবী থেকে বিদায়ী এই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা পরম ধৈর্য্য ধারন করে এই দোয়া যখন পড়ে আল্লাহ্ তা'লা তখন মরহুমের পদমর্যাদা যেভাবে উন্নীত করে দেন তেমনি ভাবে মরহুমের ছেড়ে যাওয়া শোকাভিভূত আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করে থাকেন।

সম্প্রতি আমাদের অতীব প্রিয় এক স্নেহভাজন, জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ছাত্র রেযা সেলীম এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ২০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন।

একজন, তার প্রিয়ভাজন এক বন্ধু আমাদের জানিয়েছেন যে, ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়ার দু'ঘন্টার ভিতর তিনি নিজ স্ত্রীসহ সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মরহুমের পিতা-মাতার কাছে যান। তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর আশ্চর্য্যের কোন সীমা ছিল না যখন মরহুমের মা বললেন যে, সে আমার বড়ই প্রিয় সন্তান ছিল, কিন্তু যিনি তাকে ডেকে নিয়েছেন তিনি তারও চেয়ে বেশি প্রিয়। এই হলো সেই মু'মিন সুলভ উত্তর যা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের মাঝে দেখতে পাই। কোন হৈচৈ বা আহাজারি নেই। হ্যাঁ, আক্ষেপ বা দুঃখ হয়, যার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মানুষ কাঁদেও এবং দুঃখের আতিশয্যে ভারাক্রান্তও থাকে। আর যুবক ছেলে হারানোর কষ্ট মায়ের চেয়ে বেশি আর কে অনুভব করতে পারে বা সন্তানের মৃত্যু বেদনায় মায়ের চেয়ে বেশি জর্জরিত কে হতে পারে? বা পিতার চেয়ে অধিক, কে তার যুবক ছেলের ইন্তেকালের বেদনা অনুভব করতে পারে? পিতা সম্পর্কেও আমাকে বলা হয়েছে যে, দুর্ঘটনার সংবাদ শুনতেই চরম শোকে তিনি মুহ্যমান ছিলেন, কাঁদছিলেনও আর একই সাথে দোয়াও করে থাকবেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ আসে যে, ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন। আর তখন তিনি শান্ত হয়ে যান।

অতএব, প্রকৃত মু'মিনের উন্নত মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ এভাবেই দেখা যায়। যুবক সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু এত স্বল্প সময়ে ভুলে যাওয়া সম্ভব তো নয় তবে একজন মু'মিন খোদার সমীপে উপস্থিত হয়ে তার দুঃখকষ্ট বর্ণনা করে, ক্রন্দনও করে, আর আত্মিক প্রশান্তি লাভ এবং মরহুমের মর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়াও করে থাকে। আমি জার্মানীতে সফরে ছিলাম। আমার ফিরতি সফরও সেই দিনেই আরম্ভ হয়। যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সংবাদ পাই যে, দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর পথিমধ্যে ইন্তেকালেরও সংবাদ আসে। তখন প্রিয়ভাজনের চেহারা বারংবার আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। দোয়ার তৌফিকও পেতে থাকি। সে অত্যন্ত প্রিয় এবং আদরের এক যুবক ছিল।

জামেয়া আহমদীয়া, ইউ কে-র ছাত্ররা রীতি অনুযায়ী আমার সাথে যেহেতু নিয়মিতই সাক্ষাত করে থাকে তাই তাদের সবার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পরিচিতিও রয়েছে। মুলাকাতের সময় বাড়তি কিছু সময় থাকলে আমার সাথে তারা প্রশ্নোত্তর মূলক আলোচনাও করে থাকে। আমার সাথে এই যুবকের শেষ যে সাক্ষাতটি হয় তখন কিছু প্রশ্ন তার মাথায় ছিল, যার উত্তর প্রদান কিছুটা সময় নেয়। আমি তাকে বিস্তারিত ভাবেই বুঝিয়েছি। তার পিতার বলার পর আমার মনে পড়ছে যে, এই সাক্ষাতের পর স্নেহের রেযা খুবই সন্তুষ্ট এবং আনন্দ বোধ করছিল যে, আজকে মোটামুটি ১৫/১৬ মিনিটের এই সাক্ষাতে আমার প্রশ্নের বিশদ উত্তর আমি পেয়েছি। সবসময় তার চোখে খিলাফতের জন্য বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ এক চমক বা ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করতো। সে যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমার ধারণা ছিল যে, হয়তো খেলা-তামাশা বা ক্রীড়া-কৌতুকেই তার আগ্রহ বেশি, আর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর যেমন থাকে তার মাঝেও তেমনই থাকবে, শৈশবে বা কৈশোরে যেমনটা হয়, এই ছেলের অবস্থাও তেমনই হবে। কিন্তু এই ছেলে আমার ধারণা পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। পড়ালেখায়ও মেধাবী প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে খেলাধূলায় তার আগ্রহ ছিল কিন্তু নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রেও সে ছিল যোজন-যোজন এগিয়ে। আন্তরিক এক প্রেরণায় ছিল সমৃদ্ধ যে, 'খিলাফত এবং ধর্মের সুরক্ষার জন্য আমি নাঙ্গা তরবারি হয়ে যাব', আর যেভাবে তার কতিপয় বন্ধু কতক ঘটনা তুলে ধরেছে তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, সে এটি করেও দেখিয়েছে।

তার বহু বন্ধু, সহপাঠি, জামেয়ার ছাত্ররা, ভাই-বোন এবং পিতা-মাতা আমার কাছে

এই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষেরই একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। বরং কোন কিছুই স্থায়ী নয়। কতক একান্ত শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আর কতক যৌবনে, কেউ বৃদ্ধ বয়সে বা কেউ চরম বার্ধক্যে পৌঁছায়, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে

أَرْذَلِ الْعُمُرِ

আখ্যা দিয়েছেন আর সেই বয়সে পৌঁছে মানুষ পুনরায় শৈশবের পরমুখাপেক্ষিতা এবং জ্ঞানহীনতার শিকার হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

তার গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। একটি কথা প্রায় সকলেই লিখেছে যে, বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় আত্মাভিমান, খিলাফতের সাথে সম্পর্কের নিবিড়তা এবং ভালোবাসা, আতিথেয়তা, অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এসবই ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এমন মানুষ সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় আর সবাই যাদের প্রশংসাও করে থাকে। এই যুবক ধর্ম সেবার এক বিশেষ চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। আর খেলাধূলা এবং হাইকিংয়ে হয়তো এজন্য অংশ নিত কেননা ধর্ম সেবার জন্য দেহ সুস্থ্য থাকা আবশ্যক। তার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে এই প্রিয় যুবক সম্পর্কে যারাই যা লিখেছেন তদের প্রতিটি কথা তার সুন্দর গুণাবলীর পরিচায়ক।

স্নেহের রেযা সেলীম আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে কর্মরত সেলীম জাফর সাহেবের পুত্র। তিনি ২০১৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর ইতালীতে হাইকিংয়ের সময় এক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন। ১৯৯৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি যুক্তরাজ্যের গিলফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটেছে পূর্ব-পুরুষানুক্রমে, তার বড় দাদা জনাব আলাদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে, যার নিবাস ছিল কাদিয়ানের নিকটবর্তী এক গ্রামে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। এই স্নেহভাজন রেজা সেলীম ২০১২ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। তিনি তার পুরুষানুক্রম ধারায় প্রথম মুবাল্লিগ হতে যাচ্ছিলেন আর দরজায়ে সালেসা উত্তীর্ণ হয়ে 'রাবেয়া' শ্রেণীর প্রবেশ-পথে ছিলেন। মরহুম মূসীও ছিলেন। তিনি ওসীয়্যত ফরম পূরণ করেছিলেন যার মঞ্জুরীর কার্যক্রম চলছিল, আমি কারপরদাযকে এ প্রসঙ্গে লিখে দিয়েছি যে, তার ওসীয়্যত আমি মঞ্জুর করছি। পিতা মাতা ছাড়া তার দুই ভাই এবং দুই বোন রয়েছে।

জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শিক্ষক এবং হাইকিংয়ের ইনচার্জ হাফিয এজাজ আহমদ সাহেব ঘটনার সময় সাথে ছিলেন। এই ঘটনার কিছু বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেন, একদিন পূর্বে আমরা পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করার পর ৫০০ মিটার নিচে একটি কাঠের ঘরে রাত অতিবাহিত করি। অর্থাৎ উপর থেকে নিচে নেমে আসি। দুর্গম যে পথ, তা আমাদের অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের সাথে অন্য আরো ১০জন হাইকারও ছিল। সকাল প্রায় ৮টার দিকে আমরা সেই কাঠের ঘর থেকে ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করি। তখন আবহাওয়াও সম্পূর্ণ অনুকূলেই ছিল। আমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ স্নেহের রেযা সেলীমের পা ফসকে যায় বা কোন পাথরের সাথে হোঁচট খায়, যার কারণে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেননি এবং ঢালু অধিক হওয়ার কারণে দ্রুত গতিতে নিচের দিকে যেতে থাকেন আর শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এবং তার মাথা নীচাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে এসে লাগে। যদিও তিনি মাথায় হেলমেট পরিহিত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে আঘাত লাগে মাথাতেই। যেহেতু খাড়াভাবে পড়তেছিলেন তাই ডাক্তারদের ধারণা পতিত হওয়া কালে পূর্বেই হয়তো তার চেতনা হারিয়ে যায় অর্থাৎ মাথায় আঘাত লাগার আগেই তার চেতনা লোপ পায় বা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক, সেই সময় অধম তাকে ধরার চেষ্টা করি কিন্তু সফল হইনি। আমার পরে আরেকজন ছাত্র, স্নেহের হুমায়ূন, যিনি সামনে যাচ্ছিলেন, তাকে দ্রুত ডেকে বলি, তিনিও ধরার চেষ্টা করেন আর স্নেহের হুমায়ূনের হাত তাকে স্পর্শও করে কিন্তু তিনিও তাকে ধরতে সক্ষম হননি। স্নেহের রেযা সেলীম দ্রুত উপত্যকার গভীর খাদে পড়ে যান। দুর্ঘটনায় পতিত হতে দেখে অন্যান্য কতিপয় ছাত্রও তাকে উদ্ধারের জন্য নীচে নামার চেষ্টা করে কিন্তু আমি তাদেরকে বারণ করি কেননা এর ফলে বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। তখন অন্যান্য পর্বতারোহীদের সাহায্যে অবশিষ্ট ছাত্রদেরকে উপরে নিয়ে আসি, তারাও অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিল। সেই সময় অন্য ছাত্র যারা সাথে ছিল, ঘটনার আকস্মিকতার কারণে তাদের চলার শক্তি যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর ফোনে ইমার্জেন্সি সার্ভিসকে সংবাদ দেয়া হয় আর ২০ মিনিটের ভেতর হেলিকপ্টার চলে আসে। স্নেহের রেযা সেলীম আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই ছিল। আমরা হেলিকপ্টারকে সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিলে তারা হেলিকপ্টারের সাহায্যে সেখানে উদ্ধারকারীদের নামিয়ে দেয়। আমাদের পুরো গ্রুপ যতক্ষণ পর্যন্ত হেলিপ্যাডে না পৌঁছায় ততক্ষণ তারা ছাত্রদেরকে স্নেহের রেযা সেলীমের ইন্তেকাল সম্পর্কিত কোন সংবাদ দেয়নি। সব ছাত্ররা যখন নিরাপদে হেলিপ্যাডে পৌঁছে যায় তখন জরুরী উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা আমাদের ছাত্রদের রেযা সেলীমের ইন্তেকালের সংবাদ জানায়। এরপর এক ঘন্টার ভেতর সকল ছাত্রকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহরে পৌঁছানো হয়। এই দুর্ঘটনার সময় আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ছিল। আমরা যে ট্র্যাক বা পথ ধরে যাতায়াত করছিলাম এর নামই হলো 'নরমাল ট্র্যাক টু পীক'। আর রেযা সেলীমের পিতা সেলীম সাহেবও সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, সেখানে স্থানীয় লোকদের সাথে সাক্ষাত হয় আর তারা জানিয়েছে, এটি সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা, কঠিন কোন পথ নয়, আমাদের সন্তান-সন্ততিরাও এই পথ অতিক্রম করেই থাকে। এছাড়া এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আসেন, তিনিও বলেন যে, আমি প্রতিদিন এখানে ভ্রমণ করতাম। তিনি আরো বলেন, সাধারণত ছোট-বড় সবাই এই পথে যাতায়াত করে। সেখানকার স্থানীয়দের যারাই এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছে সবাই বলে যে, বাহ্যত এই রাস্তায় কোন ঝুঁকি ছিল না, খোদার ঐশী তক্বদীর বলেই মনে হয়। যাহোক, এ পুরো তথ্য বিস্তারিতভাবে আমি এজন্য বললাম কেননা ফোনে অনেকে এবং হোয়াটস্এ্যাপে বা অন্যান্য মাধ্যমেও কিছু ভ্রান্ত মন্তব্যও কেউ কেউ করছেন যে, হয়তো একা বেরিয়ে গিয়েছিল, আবহাওয়া ভালো ছিল না, পুরো ব্যবস্থা নেওয়া ছিল না, সঠিক পোষাক পরিধান করেনি ইত্যাদি। অথচ স্থানীয় পত্রিকাও এই সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, তারা পুরো প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম পুরোই নিয়েছিল আর সঠিক পোষাকও পরিহিত ছিল। অতএব, যারা এমন মন্তব্য করে থাকে তাদেরও বিবেক বুদ্ধি খাটানো উচিত। এমন দুখঃজনক ঘটনাকালে সময় বৃথা মন্তব্য করার পরিবর্তে সহানুভূতি ব্যক্ত করা উচিত। এই ঘটনায় ব্যবস্থাপকদেরও কোন দোষ-ত্রুটি নেই অথবা অন্য কারো দোষ-ত্রুটিও নেই। আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত একটি সময় থাকে, সেই সময় এসে গেছে, আর পা ফসকে গেছে বা পাথরে হোঁচট খেয়েছে কিংবা মাথা ঘুরে বা যে কোন কারণেই হোক পড়ে গেছে। যাহোক তকদ্বীর

এটিই ছিল, আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তার জীবনকাল এতটাই নির্ধারিত রেখেছিলেন। অন্যান্য ছাত্র যারা সাথে ছিল তারাও একারণে শোকাভিভূত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও মনোবল এবং দৃঢ়তা দান করুন, তারা যেন দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। স্মৃতি ভোলানো সম্ভব নয় যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি। বন্ধুদের মাঝে আলোচনাও হতে থাকবে। কিন্তু জামেয়ার ছাত্রদের মাঝেও এর ফলে কোন প্রকার নৈরাশ্য দেখা দেওয়া উচিত নয় এবংকোন ভয় ভীতিও বিরাজ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সেলীম জাফর সাহেব লিখেন, সে আমার বড়ই স্নেহের সন্তান ছিল,বহু গুণাবলীর আধার ছিল। তিনি বলেন, এর মাঝে কয়েকটির কথা আমি উল্লেখ করছি, সবসময় সত্য বলতো। কোন ভুল হলে গোপন করতো না। বকা-ঝকার ভ্রুক্ষেপ করতো না। ভুল স্বীকার করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ছিল তার অভ্যাস। শিশুদের খুবই ভালোবাসতো। বোনের সন্তানদের প্রতি তার গভীর স্নেহ ছিল। তার বোন নিজ সন্তানদের বকা-ঝকা করলে তিনি এতই স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, নিজেই কেঁদে ফেলতেন, এবং বলতেন, বাচ্চাদের বকাঝকা করলেই সংশোধন হয়ে যায় না। মুলাকাতের কথা আমি পূর্বেই বলেছি, তিনিও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, যখনই মুলাকাত হতো অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাকে ফোনে অবহিত করতো যে, আজকে হুযূরের সাথে সাক্ষাত হয়েছে আর আমাদেরকেও সেই আনন্দে অংশীদার করতো। তিনিও যেহেতু একই অফিসে আছেন, বলেন, মুলাকাতের পূর্বে অফিসে এলে অবশ্যই নেইল কাটার চাইতো যে, ভিতরে যাচ্ছি, মুসাফাহ্ করতে গিয়ে কোথাও আমার নখ না লেগে যায়। কতজন এমন আছে যারা এত সূক্ষ্মতার সাথে কোন বিষয় দেখে বা অনুভব করে। অন্যদের ভালো কোন জিনিস আছে দেখতে পেলে আনন্দিত হতো। শৈশব থেকেই আমরা যখনই চকলেট বা অন্য কোন কিছু তার জন্য নিয়ে আসতাম, যদি এক সপ্তাহ চলার মত কিছু হতো, তাহলে প্রথম দিন তার হাতে আসতেই তা নিয়ে গিয়ে সহপাঠীদের মাঝে বিতরণ করে দিত। জামেয়ায় অধ্যয়নকালেও লন্ডনের বাহির থেকে যারা এসেছে, যাদের পক্ষে সপ্তাহান্তে বাড়ী যাওয়া সম্ভব নয় তাদের সম্পর্কে মাকে বা বোনদেরকে আগাম বলতো যে, আমার সাথে বন্ধুরাও আসছেন, তারা আমাদের সাথেই খাবার খাবেন, তাই খাবার প্রস্তুত রাখুন। তাকে যদি হোস্টেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন খাবার জিনিস দেয়া হতো তাহলে পর্যাপ্ত হলে নিয়ে যেত এজন্য যে, আমার রুমমেটদের জন্যও যেন পর্যাপ্ত হয় নতুবা রেখে যেতো এবং বলতো, আমি লুকিয়ে কিছু খেতে পারবো না। বন্ধুদের কাপড় চোপড়ও অনেক সময় সে ঘরে নিয়ে আসতো এই বলে যে, এগুলো বন্ধুদের কাপড়, ধুয়ে ইস্ত্রী করে দিন। ভাইবোনদের সাথে গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তার। পুরো দায়িত্ববোধের সাথে সবার কাজ করে দেয়া আর সেবা ও যত্ন-আত্তি করা তার রীতি ছিল। তিনি নিঃসন্দেহে খরচের হাত নিজের বেলায় সংযত রাখতেন, কার্পণ্য বলা উচিত নয়, তবে অপব্যয় করতেন না।

কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তার হাত ছিল উন্মুক্ত। ওসীয়্যতও করেছিলেন, আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার ওসীয়্যত মঞ্জুরও হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি বাঁধভাঙ্গা ভালোবাসা ছিল তার। খিলাফত বিরোধী কোন কথা শোনাই পছন্দ করতেন না। আর বাজে কোন কথা শুনলে নীরব থাকতেন না। এমন কোন কথা শুনলে সে যে-ই হোক সর্বদা তার চেহারা রক্তিম হয়ে যেতো। যেহেতু খুবই ধৈর্য্যশীল ছিলেন, কখনো কিছু চাইতেন না, তাই তার অভাব বা চাহিদার প্রতি আমাদেরই সজাগ থাকতে হতো। পড়ালেখার সময়, যুক্তরাজ্যের বাইরের ছেলেদের বিশেষ করে ইউরোপ থেকে যারা আসে তাদের ইংরেজীর ক্ষেত্রে সাহায্য করতো। অনেক ছেলেরাও আমাকে লিখেছে এবং সিনিয়র ছাত্ররাও লিখেছে যে, আমাদের ইংরেজী পরীক্ষার সময় সে অনেক সাহায্য করতো, আমাদেরকে পড়াত এবং বোঝাত। রাগ বলতে কিছুই তার মাঝে ছিল না। সর্বদা তাকে হাসিখুশিই দেখেছি। এই কথাটি সবাই লিখেছে। নির্মল হাস্যরসে অংশ নিত আর উপভোগও করতো। রীতিমত নামায পড়তো। ওয়াকফে নও তো ছিলই। তার পিতা বলেন যে, ওয়াকফে জিন্দেগী হওয়ার সম্মানও আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। সর্বদা সত্য বলার মাধ্যমে সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্য থেকে নিজের সামর্থ অনুসারে অংশ পেয়েছে। আমার দীর্ঘ বাসনা ছিল যে, সে মুরুব্বী হয়ে জামাতের সেবা করবে। তিনি আমাকেও একথা বলেছেন। আমি তখন তাকে বলি যে,

খোদা তা'লা আমাদেরকে প্রতিটি কষ্ট আর সমস্যায় এবং আক্ষেপ ও দুঃখ-বেদনাকালে খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার জন্য ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন-এর দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ আমরা খোদা তা'লারই, আর তাঁরই পানে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আর পৃথিবী থেকে বিদায়ী এই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা পরম ধৈর্য্য ধারন করে এই দোয়া যখন পড়ে আল্লাহ্ তা'লা তখন মরহুমের পদমর্যাদা যেভাবে উন্নীত করে দেন তেমনি ভাবে মরহুমের ছেড়ে যাওয়া শোকাভিভূত আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করে থাকেন।

এই ছেলে জামেয়ার পড়ালেখা শেষ করার পূর্বেই মুরুব্বী হয়ে গেছে। অন্য আরোকিছু ঘটনার আলোকে আমি উল্লেখ করবো যে, তার মাঝে তবলীগ এবং তরবীয়্যতের জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা ছিল। আর এই সফরও যেভাবে আমি বলেছি, নিঃসন্দেহে সুস্থ্য দেহ লাভের জন্যই সে পর্বতারোহনের এই সফর অবলম্বন করেছে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটিও একটি ধর্মীয় সফর হিসেবে গন্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন, তাঁর নৈকট্য

প্রাপ্তদের মাঝে তাকে স্থান দিন। এছাড়া তার পিতা এটিও লিখেছেন যে, একবার ওয়াকফে আরযির জন্য সে ম্যানচেস্টার গিয়েছিল। ফিরে আসার দিন কেউ তার পকেটে একটি খাম গুঁজে দেয়। সে খুলে দেখে, তাতে কিছু নগদ মুদ্রা রয়েছে। রেযা তখন হাসিমুখে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই টাকা ফেরত দেয় এবং বলে যে, আঙ্কেল! এটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য নিষেধ। কয়েক দিন পর সেই ব্যক্তি আমাকে চিঠিও লিখে যে, এক ছোট বালক যে মুরুব্বী হচ্ছে বা মুরুব্বী প্রশিক্ষন নিচ্ছে, এখানে সে এসেছিল আর আমাদের সবাইকে আশ্চর্যান্বিত করে চলে যায়। তিনি লিখেন, এমন সন্তানরা মুরুব্বী হলে জামাতে অবশ্যই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসবে কেননা তাকে টাকা সাধা হলেও সে তা নিতে অস্বীকার করে আর অত্যন্ত কষ্ট করে সে নিজ দায়িত্ব পালন করেছে।

তার মা লিখেন যে, আমার পুত্র, পিতা-মাতা এবং জামাতের প্রতি ছিল আনুগত্যশীল। আমার সাথে তার গভীর মমতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এমনিতে তো, সব পিতা মাতারই সন্তানদের সাথে মমতাপূর্ণ সম্পর্কই থাকে তবে তার ভালোবাসার ধরন-ধারণ ছিল অভিনব। অত্যন্ত যত্নবান, মান্যকারী, তুচ্ছ্যাতিতুচ্ছ্য বিষয়েও খুবই শ্রদ্ধা-ভরে কথা বলতো। ছোট-বড় সবার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করতো। গৃহ-কার্যে আমাকে সাহায্য করতো। যখনই ঘরে থাকতো কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞেস করতো, আপনি কি ক্লান্ত, আমি কি সাহায্য করবো! আমাকে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখা পছন্দ করতো না আর এটি বলতো যে, আপনার চোখে আমি যেন পানি না দেখি। জামেয়া থেকে আসতেই বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করতো, পুরো সপ্তাহ কেমন ছিলেন সবাই। গভীর আগ্রহের সাথে সবার খোঁজ খবর নিত। তার বয়স যখন খুব কম ছিল তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) ইসলামাবাদ গেলে স্কুল থেকে ফিরতেই ছুটে যেত যে, আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি আর একই সাথে তার সাথে ভ্রমণও করবো। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা রাবওয়ার অধিবাসীনি, তিন এখন অসুস্থ্য আর আজকাল এখানেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। সেলীম জাফর সাহেবের গৃহিনীর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। সেলীম রেযা বলতো, আমি তার জন্য অনেক দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সেলীম রেযার দোয়া গ্রহণ করুন। তিনি (ডাক্তার সাহেব) আরো লিখেন যে, জুমুআর দিন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার ঘরে অনেক মানুষ আসছে আর অনেক ছবি তোলা হচ্ছে। গভীর দুশ্চিন্তা নিয়েআমি জেগে উঠি আর আমার স্বামীকে বলি যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যার কারণে আমি খুবই ভীত। এই স্বপ্নের অর্থ আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না, আপনি সকালেই সদকা দিন। তিনি বলেন, অফিসে গিয়েই সদকা দিয়ে দিব। কিন্তু তার পূর্বেই এই দুঃখজনক সংবাদ এলো। তার মা বলেন, যখনই আমি তাকে কোন কাপড় কিনে দিতাম সে আনন্দের সাথে তা পরিধান করতো এবং খুব প্রশংসা করতো। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যে অনেক অগ্রগামী ছিল। কেউ তাকে একবার আমন্ত্রণ করলে ভুলতো না আর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হতো বা কেউ ইসলামাবাদ এলে তাৎক্ষনিকভাবে ঘরে এসে বলতো যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরা এসেছেন, খাবার রান্না করুন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়াতে দাওয়াত দিন।

তিনি আরো লিখেন যে, সফরে যাওয়ার পূর্বে ফোনে আমাকে উর্দূ লেখা শিখাতে থাকে এবং বলে যে, আপনাকে অন্যান্য ভাই বোনদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে, কেমন আছি। তাই আপনি নিজেই আমাকে উর্দূতে লিখুন আর আমি স্বয়ং আপনাকে উত্তর দিব। তিনি বলেন, আমি যে নসীহতই করেছি তা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করতো আর নিজ বন্ধুদেরকেও সে একই কথা বলেছে। খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল, জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষুদ্র নির্দেশও মেনে চলার চেষ্টা করতো। তার মা বলেন, একবার আমাকে বলে যে, আমার ইচ্ছা হয় যেন খুব ভালো মুরুব্বী হয়ে জামাতের অনেক তবলীগ করতে পারি। আমি এত আহমদী বানাতে চাই যা দেখে আমার প্রতি আপনার গর্ব হবে।

তার বোন রাফিয়া সাহেবা বলেন, সে আমাদের বড়ই আদরের ভাই ছিল। যদিও ছোট ছিল কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল খুবই গভীর। ছোট হয়েও সবার প্রতি যত্নবান ছিল। সকল বয়সের মানুষের সাথে তাদের বয়স অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা-বার্তা বলতো। আজ পর্যন্ত সে কারো মনে আঘাত করেনি। ভদ্রভাবে সব কথা শুনতো আর সশ্রদ্ধ উত্তর দিত। পূর্বে কাজ করার জন্য বহু কর্মী ইসলামাবাদে যেতো, সংস্কারমূলক অনেক নির্মাণ কাজ সেখানে হতো, লাজনা হল নির্মাণাধীন অবস্থায় তাদের দেখাশুনা করা, চা পৌঁছানো বা অন্যান্য খাদ্য পানীয় সরবরাহ করার জন্য সবসময় তাদের সেবায় সে নিয়োজিত থাকতো। আর সবাই বলাবলি করতো যে, কেবল এই ছেলেই আমাদের খবরাখবর রাখে।

তার ভাই আসাদ সেলীম সাহেব বলেন, খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। সহজ-সরল ও স্পষ্ট কথা বলতো। সম্প্রতি আমরা তাকে একটি নতুন গাড়ি কিনে দিয়ে সারপ্রাইজ দেই। তার ভাই ভালো চাকরি করেন, ছোট ভাইকে তিনি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। রেযা সর্বপ্রথম এই গাড়ি সম্পর্কে যা জিজ্ঞেস করে তা হলো এর মূল্য কত, এবং বলে, মুরুব্বী হিসেবে আমার সাদামাটা জীবন যাপন করা উচিত, আর বেশি দামী জিনিস নেয়া উচিত নয়।

তার বোন আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো কারো সমালোচনা শুনা পছন্দ করতো না। তার আরেকটি গুণ হলো মানুষের নেতিবাচক ধ্যান-ধারণাকে সে ইতিবাচকে পাল্টে দিতে পারতো। তার কথা ছিল, মানুষের ভালো গুণাবলীর ওপর আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত, তাদের দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। তার সরলতার একটি দৃষ্টান্ত হলো ঈদে তার জন্য মা নতুন কাপড় ক্রয় করলে, সেই কাপড় পরে সে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়তো যে, এই কাপড়ে কোথাও আবার অপ্রয়োজনীয় কৃত্রিমতা বা লোক দেখানো ভাব না প্রকাশ পায়। তাই পুরোনো কোন কাপড় বা জ্যাকেট ইত্যাদি সেই নতুন কাপড়ের ওপর পরে নিতো।

জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক কুদ্দূস সাহেবও এই সফরে সাথে ছিলেন। তিনি বলেন যে, আশৈশব আমি তাকে জানি। রেযা সেলীম যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমি শাহেদ ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধম তার সাথে মাত্র এক বছরই কাটিয়েছি। কিন্তু খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়তি ক্লাস, ইজতেমা এবং জলসা সালানায় এক সাথে দায়িত্ব পালনের বা ডিউটি করার সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবও আমাকে বলেছেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমার সময় প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলাকালে বিভিন্ন

ছেলেদের সাথে সে ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতো। কুদ্দূস সাহেব লিখেন যে, স্নেহের রেযা সেলীমের ডিউটি হতো হাইজিন বিভাগে। এখানে হাইজিন বলা হয় আসলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগ। কিন্তু কখনো সে এটি বলেনি যে, আমার ডিউটি এই বিভাগে কেন দেয়া হলো বরং কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং অবিচল নিষ্ঠার সাথে সে এই দায়িত্ব পালন করতো। তিনি আরো বলেন, জামেয়াতে আমার পড়ানোরও সুযোগ হয়েছে। সে খুবই বুদ্ধিমান এবং মেধাবী ছাত্র ছিল। ক্লাসে সবার আগে এসে মনোযোগ সহকারে বসতো। সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতো। কোন সময় সে রাগ প্রকাশ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না বরং সবসময় অন্যদেরকে সাহায্য করার লেগে থাকতো। ক্রিকেট খেলার প্রতিও আগ্রহ ছিল। কিন্তু স্কোর ইত্যাদি দেখতে হলেও সর্বদা শিক্ষকের অনুমতি নিয়েই ক্লাস থেকে যেত। তিনি বলেন, এই হাইকের সময় এক রাত আমরা কাঠের ঘরে কাটিয়েছি যার গোসল খানার দরজায় লক ছিল না। সবাই তাকে বলে যে, তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাক। সানন্দে সে এই ডিউটি পালন করে আর এটিও বলে যে, রাতে যদি কারো যেতে হয় তাহলে তখনও আমাকে নির্দ্বিধায় ঘুম থেকে উঠিয়ে দিও। এই হাইকিংয়ের পর নিজ সহপাঠী স্নেহের জাফরের সাথে ক্রোয়েশিয়া যাওয়ার কথা ছিল তার। হাইকিংয়ের সময় জাফরের চোখে চোট লাগে। তখন সে বারবার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে যে, হাইক থেকে নীচে গিয়েই ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা হাসপাতালে তোমার চেকআপ করাব। তিনি লিখেন যে, রেযা সেলীম খুবই নিষ্ঠাবান এক ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন। পরিশ্রমী, অবিচল, সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা ছিল তার উন্নত বৈশিষ্ট্য।

অনুরূপ ভাবে জামেয়ার আরেকজন শিক্ষক জহীর খান সাহেব লিখেন, গত দু'বছর ধরে রেযার ক্লাসকে পড়ানোর তৌফিক পাচ্ছিলাম। অধম এই যুবকের মাঝে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এটি দেখেছি যে, তার ওপর যেই কাজই ন্যস্ত করা হতো, সে কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে তা পালন করতো। অনেক সময় দেখি, নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত অন্য ছাত্ররা এদিক সেদিক চলে গেলেও সে একাই সেই কাজ করে চলেছে। আর যতক্ষণ কাজ শেষ না হতো সে নিজ সাধ্য অনুসারে সেই কাজে লেগে থাকতো। রেযা সেলীমের একটি আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো সে কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো না। যখনই কোন প্রশ্ন সে করতো তা হতো পাশ্চাত্যে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের ওপর সচরাচর যে সব আপত্তি হয় সেই সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হতো। আর প্রায়ই বলতো যে, অ-মুসলিম বা অ-আহমদী কোন বন্ধুর সাথে তার কথা হয়েছে এবং সে এই প্রশ্নটি করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সুরক্ষা এবং এর বিরুদ্ধে উত্থিত আপত্তি খন্ডনের জন্য এক শিখা প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, স্নেহের রেযা দু'একবার আমার সাথে গাড়িতে বসে লিফট নিয়েছে। সেই সময় দু'বার তার ইউএসবি স্টিক পকেট থেকে গাড়িতে পড়ে যায় আর তাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তকের অডিও রেকর্ড ছিল, আজে বাজে কোন জিনিস তার ইউএসবি-তে থাকতো না।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক সৈয়্যদ মাশহুদ আহমদ সাহেব লিখেন, সে টিউটোরিয়াল গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি জ্ঞানমূলক বিষয়াদি আর ব্যায়াম ইত্যাদি প্রতিযোগিতায়ও তার গভীর আগ্রহ ছিল। তার সাধারণ জ্ঞান বা জেনারেল নলেজ অন্যান্য ছাত্রের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। অনুরূপভাবে তিনি বলেন যে, গত বছর বয়ানবাজি অর্থাৎ কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য রেযা প্রায় পাঁচ শতাধিক পংক্তি মুখস্থ করে। আর এটি এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, পঙক্তি মুখস্থ করার পূর্বে, শুধু মুখস্থই করতো না বরং এর বিষয়বস্তুও বুঝবার চেষ্টা করতো আর এর জন্য সিনিয়র ছাত্র এবং শিক্ষকদেরও সাহায্য নিত। তিনি আরো লিখেন, রেযা সেলীমের তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল। গত বছর ওয়াকফে আরযীর জন্য তাকে ওলভার হ্যাম্পটন জামাতে পাঠানো হয়। সেখানে লিফলেট বিতরণ করা ছাড়াও স্থানীয় জামাতের সদস্যদের সাথে বেশ কিছু তবলীগি স্টলও সে করেছে। সেই সময় এক ইংরেজের সাথে তার সাক্ষাত হয় যে খুবই সক্রিয় খ্রিস্টান ছিল। স্নেহের রেযা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গবেষণার আলোকে সেই ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ এবং কাশ্মীরের দিকে হিজরতের কথা অবহিত করলে সে খুবই আশ্চর্য হয়। এরপর সে তাকে মসজিদও ঘুরে দেখায় এবং তাকে আমন্ত্রণ জানায়। আর এর পরেও তার সাথে স্থায়ী তবলীগি যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। অনুরূপভাবে স্থানীয় জামাত ইসলামাবাদ ও জামেয়া আহমদীয়ার সাথে লিফলেট বিতরণ এবং তবলীগি স্টলের কাজে অংশ নিতে সে সবসময় উদগ্রীব থাকতো। গত বছর তার ক্লাসের কিছু ছাত্র বা জামেয়ার কিছু ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে স্পেন গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, সেখানে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লিফলেট বা প্যাম্ফলেট বিতরণ করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই গ্রুপ সেখানে পঞ্চাশ হাজার পাঁচ শত লিফলেট বিতরণ করে দিল।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক মনসুর জিয়া সাহেব লিখেন, সে খুবই শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির ছাত্র ছিল। আমি তাকে কখনো ভ্রু কুঞ্চিত করতে দেখিনি বা রাগের কোন লক্ষণ তার চেহারায় দেখিনি। খিলাফত এবং জামাতী বিশ্বাস সম্পর্কে কেউ অযথা কোন আপত্তি করলে তার চেহারায় প্রচন্ড রাগ এবং ক্রোধের লক্ষণ দেখেছি। তিনি আরো লিখেন, এসব কথা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, তার প্রকৃতি খিলাফতের জন্য গভীর ভালোবাসা এবং আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে একাগ্রতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো ক্লাসে খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবার কথা যখনই বলেছি আর খুতবার প্রেক্ষাপটে কিছু জিজ্ঞেস করতাম তখন অনেক কথাই তার ঠোঁটস্থ থাকতো। সে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতো। এরপর তিনিও একই কথা বলেছেন যা অন্যরাও লিখেছে যে, আমি দেখেছি তার মাঝে ছিল তবলীগের প্রতি এক গভীর অনুরাগ। সোশাল মিডিয়াতে অ-আহমদীদেরকে তবলীগ করা তার দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষকদের দিক নির্দেশনায় কঠোর পরিশ্রম করে সে অ-আহমদীদের আপত্তি সমূহ রদ করে যুক্তিযুক্ত উত্তর দিত।

তার এক সহপাঠি স্নেহের সফির আহমদ লিখেন যে, আমার নিবাস বেলজিয়ামে। সে জানতো যে, আমি সপ্তাহান্তে বাসস্থানে যাই না, তাই উইকেন্ডে নিয়মিতভাবে ঘরের রান্না করা খাবার খাওয়ানোর জন্য আমাকে সে সাথে নিয়ে যেত। যেহেতু আমরা ইংরেজিতে দুর্বল, তাই ইংরেজি পরীক্ষার সময় বোঝানোর মাধ্যমে একই ভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সে সাহায্য করতো।

স্নেহের শাহ্‌যেব আতহারও অনুরূপই লিখেন যে, খুবই কোমলমতী, অন্যদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতকারী ব্যক্তি ছিল। সদা অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকা তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, আমাদেরকে ওয়াকফে আরযীর জন্য পাঠানো হলে আমরা সেখানকার বাজারে তবলীগি স্টল খুলি। তখন দুইজন খ্রিস্টান ব্যক্তি এলে রেযা খুবই সুন্দরভাবে তাদের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায়। মরহুমের জ্ঞান খুব ব্যাপক ছিল আর তবলীগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। কখনো রাগান্বিত স্বরে কথা বলতো না। ছেলেদের একত্রিত করে অন্যান্য নির্মল বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা নিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘটনা মনে আছে। ২০১৪ সনের আগস্টে ওয়াকফে আরযীর সময় এই অধম ও রেযা সেলীম মরহুম তবলীগি স্টল খুলি। ষ্টলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে 'ব্রিটেন ফাস্ট'-এর সদস্যরা আসে। এরা ইসলাম বিরোধী। তারা তাদের লিফলেট বিতরণ করছিল। আমাদের কাছে পৌঁছে এরা রেযা সেলীমের সাথে রাগত স্বরে প্রশ্ন করতে থাকে, কিন্তু তিনি ধৈর্য্য এবং নমনীয়তার সাথে সব প্রশ্নের উত্তর দেন। অবশেষে তারা জানতে পারে যে, এরা (অর্থাৎ আহমদীরা) সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা কট্টর পন্থী।

অনুরূপভাবে তার সাথের আরেক জন জামেয়ার ছাত্র যাফের বলেন, ক্লাসরুমে তার সাথে বসেছিলাম। হঠাৎ সে মার্কার হাতে নিয়ে বলে, যাফের! আমরা জামেয়ায় অনেক সময় নষ্ট করছি, এবং (আমাদের অনুসৃত) টাইম টেবিল লেখা আরম্ভ করে আর ফ্রি টাইমকে হাইলাইট করে বলে, এই সময়েও আমাদের কিছু না কিছু করা উচিত এবং সময় নষ্ট না করে কাজে লাগানো উচিত।

অনুরূপভাবে অবসর সময়ে শিক্ষকদের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয় পড়ার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছিল সে। এরপর যেই ছেলের চোখের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যার চোখে সামান্য আঘাত আসে, তিনি বলেন, আঘাত আমার সামান্যই লাগে আর শেষ অবধি পর্যন্ত বারবার এসে বলতে থাকে যে, যাফের! নিচে পৌঁছেই আমরা হাসপাতালে যাব যেন তোমার সঠিক চিকিৎসা নেয়া সম্ভব হয়। তিনি আরো বলেন, দুর্ঘটনার পূর্বে পাহাড় থেকে নীচে নামার সময় কোন জায়গায় আমার পা ফসকে গেলে মরহুমের আমার জন্য খুবই চিন্তা হতো আর বলতো যে, সাবধানে অগ্রসর হও। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, গত বছর হাইকিংয়ের সময় উচ্চতার কারণে আমার কষ্ট হয়, যাকে এল্টিচিউড সিকনেস বলা হয়। সে তখন আমাকে বারবার আশ্বস্ত করতো আর জিজ্ঞেস করতো যে, আমি কেমন আছি কিন্তু এটি জানতো না যে, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। এছাড়া উইকএন্ড থেকে ফিরে আসতো যখন, সেসময় সচরাচর জামাতের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হতো সেগুলো মুখস্থ করে আসতো এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে উত্তর জেনে নিত।

অনুরূপভাবে জামেয়ার আরেক ছাত্র হাফেয তাহা বলেন, খিলাফতের জন্য সে ছিল নিবেদিত প্রাণ। যুগ খলীফার প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতো। খলীফায়ে ওয়াক্ত বা নিযামে জামাতের বিরুদ্ধে কারো কোন কথা সহ্য করতো না। একবার কোন এক ব্যক্তি, জামাত থেকে যে দূরে চলে যায়, খিলাফত সম্পর্কে কোন বাজে কথা বললে রেযা তাকে বলে যে, আমি তোমার সব কথা সহ্য করতে পারি কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

এরপর আরেকজন ছাত্র দানিয়াল লিখেন যে, গত বছরের হাইকিংয়ের পর আমরা হাফিয এজাজ সাহেবের কাছ থেকে হাইকিং সংক্রান্ত বিষয়াদি শিখছিলাম এবং পরবর্তী হাইকিংয়ে যাওয়ার লেসন নিচ্ছিলাম। সে তখন খুবই আনন্দিত ছিল আর আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে সেলফোনে ভিডিও করে পাঠাচ্ছিলাম। সে আমাদের সবসময় আনন্দিত রাখার চেষ্টা করতো। তার চেষ্টা থাকতো যেন সময় নষ্ট না হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন কোন বই পাঠ করতো। রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা ছিল তার, আর বন্ধুদের বলতো যে, তাহাজ্জুদের সময় যদি সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে যেন সজোরেই জাগিয়ে দেয়া হয়। জামেয়ার পড়ালেখার পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞান অর্জনেরও গভীর আগ্রহ ছিল। জেনারেল নলেজ বা সাধারণ জ্ঞান এবং কবিতা প্রতিযোগিতার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তাতে অংশ নিত।

অতএব এমনই আরো বহু ঘটনা মানুষ তার সম্পর্কে লিখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন। এই সদ্য যুবক যেভাবে আমি বলেছি জামেয়া পাশ করার পূর্বেই উত্তম মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগ হয়ে গিয়েছিল। খিলাফতের জন্য অশেষ আত্মাভিমান রাখতো। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ার সকল ছাত্রদের তৌফিক দিন তারাও যেন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী থাকে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনকারী হয়। স্নেহের রেযার বন্ধুরা কেবল তার গুণাবলীই যেন বর্ণনা না করে বরং বন্ধুত্বের দাবি হল, তার গুণাবলী অবলম্বন করে নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করে, আর আমারও এবং ভবিষ্যতে আগত খলীফাদেরও সর্বোত্তম সাহায্যকারী এবং 'সুলতানে নাসীর' যেন সর্বদা তাদের হস্তগত হতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা তার পিতা মাতা এবং ভাইবোনদেরও আত্মিক প্রশান্তি দান করুন। আর খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে যেই ধৈর্য তারা প্রকাশ করেছেন এর ওপর যেন সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন আর খোদার কৃপাবারি যেন লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের সকল পরীক্ষা এবং সমস্যা থেকে তাদেরকে সুরক্ষা দান করুন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা জানাযা হাযের হবে। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াব, বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে থাকবেন।

[কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।]

পুত্র-সন্তান লাভ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ৬ই নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ রোজ রবিবার আমরা এক পুত্র-সন্তান লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। হুযূর (আই.) তার নাম রেখেছেন **আহসান ইসলাম**। দাদা: মরহুম মোঃ আমীর খসরু (ঢাকা) ও নানা: মরহুম ফারুক আহমদ ভূইয়া (বি. বাড়িয়া)। সে একজন ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্য। আমরা যেন সঠিকভাবে তালিম-তরবিয়তের মাধ্যমে তাকে লালন-পালন করতে পারি এবং মহান আল্লাহ্ যেন সর্বাবস্থায় তার নিগরানী করেন সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ও ফাতেমা ইসলাম রোশনী
ঢাকা

জুমুআর খুতবা

অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান শান্তি ও সম্প্রীতির চাবিকাঠি

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে নিজের জন্য যা চায় নিজ ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে। এটি এমন এক সোনালী নীতি যা পৃথিবীর সর্বস্তরে গৃহ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়, সম্পর্কের সর্বক্ষেত্রে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত রচনা করে, ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটায়, হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি বেশ কয়েকবার অন্যদের সামনে যখন এ কথা তুলে ধরি তখন তারা এতে খুবই প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভালো কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের কর্ম দ্বারা এ কথার এবং সকল ইসলামী নির্দেশের সৌন্দর্য প্রমাণ করা। নতুবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কথা তো খুবই ভালো, কিন্তু এটি বল যে, তোমাদের মাঝে কতজন এ কথা মেনে চলে, যখন সুযোগ হয় তখন কতজন এমন আছে যারা স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না? কোন কথার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায় যখন যিনি সেই কথা বলেন তিনি স্বয়ং তা মেনেও চলেন। মানুষ তখনই আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারবে যখন আমাদের কথা এবং কর্ম এক ও অভিন্ন হবে। মানুষ শুধু কথা শোনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তারা আমাদেরকে দেখেও থাকে বা আমাদের ওপর তাদের দৃষ্টিও থাকে। আমি জার্মানী সফরকালে শেষ যে জুমুআ পড়িয়েছি তাতে সম্ভবত বলেছি যে, মসজিদের উদ্বোধনের সময় জার্মানীতে সেই অঞ্চলের জেলা কমিশনার এই আপত্তি করে যে, তোমরা মহিলাদের সাথে মুসাফাহ্ বা করমর্দন না করে তাদের সাথে মন্দ আচরণ করছ। আমি যখন এর বিস্তারিত

প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে নিজের জন্য যা চায় নিজ ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে। এটি এমন এক সোনালী নীতি যা পৃথিবীর সর্বস্তরে গৃহ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়, সম্পর্কের সর্বক্ষেত্রে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত রচনা করে, ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটায়, হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

উত্তর প্রদান করি তখন এক ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা কালে এটিও বলে যে, আপনি সঠিক বলেছেন, স্বাধীনতা সবারই রয়েছে, তাদের ধর্ম বা তাদের সামাজিক ঐতিহ্য এবং রীতি-নীতি যা বলে তা মেনে চলার অধিকার তাদের আছে, যেখানে সেটি মেনে চললে সেই দেশ এবং জনসাধারণের কোন ক্ষতি হয় না।

সেই ব্যক্তি বলে, তোমাদের খলীফা এটা ঠিক কথাই বলেছেন, তবে এর বাস্তব চিত্র সামনে তখনই আসবে যখন আমরা দেখব যে, আহমদী যুবকরাও এটি মেনে চলে কিনা বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এটি মানছে কিনা। অতএব ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা কোন শিক্ষা বা নির্দেশ বা এই প্রেক্ষাপটে উন্নত নৈতিক চরিত্রের কথা বলি তখন অ-আহমদীরা বা অ-মুসলিমরা আমাদেরকে অভিনিবেশী দৃষ্টিতে দেখেও থাকে যে, তাদের নিজেদের আমল কেমন। কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, মহানবী (সা.) মু'মিনের উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য যে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলো, তোমাদের প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পরিচয় তখন পাওয়া যাবে যখন তোমাদের চারিত্রিক গুণাবলীও উন্নত মানের হবে এবং তোমাদের একের জন্য অপরের আবেগ অনুভূতির মানও উন্নত হবে। আর সেই মান কি? সেই মান হলো নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অন্যদের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। এটি হওয়া উচিত নয় যে, নিজ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে 'ন্যায়বিচার-ন্যায়বিচার' ধ্বনী উচ্চকিত করতে থাকবে আর অন্যদের অধিকার প্রদানের বেলায় নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করবে।

অতএব নিজেদের অধিকার হস্তগত করার জন্য আমরা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে পড়ি অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের একই মানদন্ডে উপনীত হওয়া উচিত। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আমরা যেমন চাই যে, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়া হোক এবং আমাদেরকে যেন ধরপাকড় করা না হয়, আমাদেরকে যেন শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে অন্য কেউ কোন ভুল করলে যার ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, এমন ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে এবং যদি একই ভুল বা অন্যায় বারবার না করে, তাহলে তার সাথেও আমাদের সেই একই ব্যবহার অর্থাৎ ক্ষমা করা উচিত। অবশ্য যদি কোন ভুল বা ভ্রান্তির কারণে জামাত বা জাতিগত স্বার্থহানি ঘটে তাহলে এটি তখন ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি থাকে না বরং ব্যক্তিগত সেই অপরাধ সামাজিক অপরাধে পর্যবসিত হয়, আর তখন এমন অপরাধীদের বিচারিক সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে।

যাহোক আমি এ কথা বলছি যে, সমাজে পারস্পরিক দৈনন্দিন বিষয়াদির ক্ষেত্রেও আমরা যেখানে মনে করি যে এটি আমার অধিকার, এখন প্রশ্ন হলো আমরা অন্যদেরও সেই অধিকার প্রদান করি কিনা বা অন্যদের সেই অধিকার প্রদানের মন-মানসিকতা আমরা রাখি কিনা। আর এই ক্ষেত্রে মৌলিক একক হলো গৃহ, বন্ধু-মহল, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। যখন ক্ষুদ্র পরিসরে বা নিজের ক্ষুদ্র গন্ডিতে এই চিন্তা চেতনা বিরাজমান থাকবে তখন সমাজের বৃহত্তর গন্ডিতেও এই একই চিন্তা চেতনার বিস্তার ঘটবে। স্বার্থপরতার অবসান হবে, অন্যের অধিকার প্রদানকারীর সংখ্যাও হবে বেশি, ক্ষমা করার প্রবণতা বাড়বে এবং শাস্তি দেয়া বা শাস্তি পাওয়ানোর প্রতি মনোযোগ কম নিবদ্ধ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও বাহ্যিক অধিকার প্রদান এবং চাহিদা পূরণের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমা করার মন-মানসিকতা অর্জনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

অর্থাৎ যারা স্বাচ্ছন্দ্যেও খরচ করে এবং অস্বাচ্ছন্দ্যেও খরচ করে, আর ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে মার্জনা করে, আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।

অতএব এখানে প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সেসব বান্দার অধিকার আদায় করে দেয়ার জন্য খরচ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা অভাবী। মোহসেন বা সৎকর্মশীল তারাই যারা অন্যদের প্রয়োজনে কাজে আসে, অন্যের হিত সাধন করে, পুণ্যের বা নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে, তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী। সুতরাং যারা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যারা অন্যের কল্যাণ সাধন করে, এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যেও খরচ করে। আর মানুষের মাঝে যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এমন মানুষ আর স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না, নিজ ভাইয়ের অমঙ্গল বা ক্ষতি চায় না। আর এমন মানুষ তখন আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নতি করে এবং সেসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মোহসেন বা সৎকর্মশীলদের আরেকটি লক্ষণ হলো তারা নিজেদের আবেগ অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে,আর এমনভাবে নিজেদের সংবরণ করে বা এমন

পরিস্থিতিতেও রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আর এর প্রমাণ তখন পাওয়া যায় যখন রাগ সংবরণ করার পর অন্যদের ক্ষমা করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এটি কোন সামান্য বিষয় নয় যে, সকল প্রকার রাগ বা ক্রোধ এবং প্রতিশোধ প্রবণতাকে মন থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি অনেক বড় বিষয় যে, রাগও হবে না আর প্রতিশোধ প্রবণতাও মন থেকে বেরিয়ে যাবে। আর শুধু এটিই নয় যে, প্রতিশোধ প্রবণতাকে মন থেকে উৎপাটন করা হবে বরং যে ভুল করে তার ওপর কিছুটা এহসানও যেন করা হয়, এটি অনেক বড় একটি বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চান মু'মিনদের ভিতর যেন এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে হযরত হাসান (রা.)-এর একটি ঘটনা পাওয়া যায় যে, একবার তার এক কৃতদাস কোন ভুল করে যার ফলে উনার অত্যধিক রাগ হয় আর তিনি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। তখন সেই কৃতদাস আয়াতের এই অংশ পড়েন যে,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

অর্থাৎ পুণ্যবানরা তো ক্রোধ সংবরণ করে। এটি শুনে হযরত হাসান শাস্তি দেয়ার জন্য যে হাত উঠিয়েছিলেন তা নিচে নামিয়ে নেন এবং হাত উঠাননি। এতে সেই কৃতদাস আরো সাহসী হয়ে উঠে এবং বলে,

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

অর্থাৎ এমন পুণ্যবানরা মানুষকে ক্ষমা বা মার্জনাও করে। তখন হযরত হাসান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী বলেন, যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এটি শুনে সেই দাস আরো সাহসী হয়ে উঠলো এবং বললো,

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এহসানকারীদের বা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন। তখন তিনি সেই কৃতদাসকে বলেন যে, যাও তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

অতএব ঐশী প্রেম লাভের আকাঙ্খী যারা এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীতি অবলম্বন করে চলে, তাদের জীবনাচার হলো, তারা শুধু দোষী ব্যক্তির দোষ ক্ষমাই করে না বরং তারা তাদের ওপর এহসান বা অনুগ্রহও করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এক জায়গায় বলেন, স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি কঠোর ব্যবহার করে এবং ক্ষেপে যায় তার মুখ বা জিহ্বা থেকে আদৌ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কথা নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে নিজ প্রতিদ্বন্দীর সামনে দ্রুত ক্ষেপে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি নোংরা এবং নিয়ন্ত্রণহীন কথা বলে তার বিবেক বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। যারা গালি দেয়, যারা লাগামহীন কথাবার্তা বলে, হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়, যা সুগভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং খোদার পছন্দনীয় কথা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। যে ক্রোধের সামনে পরাস্ত হয় তার বিবেক বুদ্ধি মোটা এবং অজ্ঞ হয়ে থাকে এবং কোন ময়দান বা ক্ষেত্রে তাকে কখনও বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ বা রাগ উন্মাদনার অর্ধেক। এটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, স্মরণ রেখ! বিবেক-বুদ্ধি এবং রাগ ও ক্রোধের মাঝে এক বৈরীতা বিদ্যমান। বুদ্ধিমান মানুষ অযথা উত্তেজিত হয় না যা ক্রোধের কারণ হয়। তিনি বলেন যখন রাগ হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি সঠিক অবস্থানে থাকতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে এক আলো বা জ্যোতি প্রদান করা হয় যার ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তিতে এক নব আলো সৃষ্টি হয়ে যায় আর এরপর সেই আলো থেকে আরো আলোর স্ফুরন হয়। রাগ বা ক্রোধের অবস্থায় মন-মস্তিষ্ক যেহেতু তমসাচ্ছন্ন থাকে তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই বিস্তার ঘটে বা অমানিশা থেকে অমানিশাই ছেয়ে যায়।

সুতরাং ইসলামী শিক্ষা গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বা গভীর হিকমতে সজ্জিত, সিদ্ধান্ত করার সময় মানুষ যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের বিরোধী হয় তখনও মানুষের চিন্তা-ভাবনার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। অনেক সময় কঠোরতাও প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু রাগের বশবর্তী হয়ে বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ইসলামে শাস্তির দৃষ্টিভঙ্গী বা শাস্তি দেয়ার শিক্ষাও রয়েছে। কিন্তু এর জন্য কিছু নিয়ম এবং নীতি নির্ধারিত আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেয়া মানুষকে হিকমত বা প্রজ্ঞা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং ন্যায় বিচার থেকে দূরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, তাই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যদি শাস্তি দাও তাহলে এটি হৃদয়ের কঠোরতা বলেই সাব্যস্ত হবে। আর হৃদয় যদি কঠোর হয়ে যায় তখন তত্ত্বজ্ঞান এবং হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা মুখ থেকে আর নিঃসৃত হয় না বরং মানুষের কান্ডজ্ঞান তখন লোপ পায়। সে কারণেই

আমি বেশ কয়েকবার অন্যদের সামনে যখন এ কথা তুলে ধরি তখন তারা এতে খুবই প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভালো কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের কর্ম দ্বারা এ কথার এবং সকল ইসলামী নির্দেশের সৌন্দর্য প্রমাণ করা। নতুবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কথা তো খুবই ভালো, কিন্তু এটি বল যে, তোমাদের মাঝে কতজন এ কথা মেনে চলে, যখন সুযোগ হয় তখন কতজন এমন আছে যারা স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না? কোন কথার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায় যখন যিনি সেই কথা বলেন তিনি স্বয়ং তা মেনেও চলেন।

আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাগ এবং ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ কর, মাথা ঠান্ডা কর, এরপর শাস্তি দেয়া বা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নাও। কিন্তু এতেও শর্ত হলো এর ভার তোমার হাতে যদি ন্যস্ত থাকে। এমন নয় যে, সবাই শাস্তি দেয়ার অধিকার পেয়ে গেছে। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। তাই ধৈর্য্যের মান উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, ধৈর্য্যশীলদের চিন্তা-শক্তি এবং বিবেককে আলোকিত করা হয়, তাদের চিন্তাধারা পরিপক্ক হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে পথের দিশা দেয়া হয়। যে কোন বিষয়ে মু'মিন বিবেক সম্মত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে, তা সেই সিদ্ধান্তটি তার নিজের কাছে অপছন্দনীয়ই হোক না কেন। তড়িঘড়ি তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না বরং ধৈর্য্যের সাথে সবকিছু দেখে শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক সবকিছু সামনে রেখে তবেই তারা সিদ্ধান্ত নেয়।

এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া চাই, যেভাবে আমি বলেছি, শাস্তি দেয়ার অধিকারও সবার নেই বা সবাই শাস্তি দিতে পারে না। যে কেউ বা যে কোন ব্যক্তি এটি বলতে পারে না যে, আমি চিন্তা করেছি আর আমার বিবেক-বুদ্ধি বলে যে, শাস্তি দেয়া উচিত তাই আমি শাস্তি দিচ্ছি। বর্তমান যুগে শাস্তি প্রদান করা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজ। মানুষ নিঃসন্দেহে তার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাকে ক্ষমা করতে পারে বা ক্ষমা করার অধিকার সে রাখে কিন্তু শাস্তি প্রদানের জন্য অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিতে হয় বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাধীনে নিতে হয়। মানুষ এই কথা যদি সবসময় নিজের দৃষ্টিগোচরে রাখে তাহলে পারস্পরিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ হয় তা হওয়ার কথা নয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলাবাজি করে নিজেদের যে সময় এবং অর্থ নষ্ট হচ্ছে তা নষ্ট হতো না। আদালতে মামলা যাওয়ার পর যদি আদালত কোন এক পক্ষের অপরাধ ক্ষমা করে তাহলে অপর পক্ষের ক্রোধ এবং রাগ আরো বেড়ে যায় যে, ক্ষমা করা হলো কেন বা লঘু শাস্তি কেন দেয়া হলো আর সে তখন সেই মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে নিয়ে যায়, অথচ বিষয় এমনও নয় যা ভয়াবহ হতে পারে, সামান্য বিষয় নিয়ে তারা এমনটি করে থাকে। আমাদের বিচার বিভাগেও এমন বিষয়াদি এসে থাকে। কোন কোন আহমদী বলে, জামাতের বিচার বিভাগ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিব না আর তারা আদালতে চলে যায়। অথচ তেমন বড় কোন বিষয় নয় যার জন্য মামলাবাজির আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। আর এ কারণে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রাগ এবং ক্রোধ সংবরণের পর ক্ষমা করার যে শিক্ষা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাশূন্যভাবে তিনি বলে দেননি যে, ক্ষমা করতে থাক, বরং ক্ষমা এবং শাস্তির হিকমত উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

(সূরা আশ্-শূরা: ৪১)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি যতটা অন্যায় করা হয় সে অনুপাতে হয়ে থাকে। অতএব যে কেউ ক্ষমা করে আর এর উদ্দেশ্য সংশোধন হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্‌র হাতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

অতএব, মূল বিষয় হলো অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে সংশোধন করা, এটি নয় যে, প্রতিশোধ নেয়া বা মামলায় জড়ানো অথবা নিজের সম্পদের ক্ষতি করা বা অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করা কিংবা নিজের ও অন্যেরও সময় নষ্ট করা এবং জামাতী প্রতিষ্ঠানের হাতে যদি বিষয় থাকে তাহলে জামাতের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করা। আসল উদ্দেশ্য, ক্ষমা করার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে ক্ষমা করা উচিত। আর সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়া যদি আবশ্যক হয় তাহলে প্রজ্ঞার দাবি হলো শাস্তি প্রদান করা। আর এরপর, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে লিখেছেন। এক জায়গায় যেমন: তিরয়াকুল কুলূব পুস্তকে তিনি বলেন,

ন্যায় বিচারের বিধিমত অপরাধ অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধকে এই শর্তের আওতায় ক্ষমা করে যে, সেই ক্ষমার ফলে অপরাধীর সংশোধন হবে, এমন নয় যে, এর ফলে সে অপরাধের ক্ষেত্রে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠবে, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট বড় পুরস্কার পাবে।

পুনরায় বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে তিনি (আ.) বলেন,

পাপের শাস্তি বিধানে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের দাবি হলো অপরাধী ততটাই শাস্তিযোগ্য যতটা অপরাধ সে করেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি মার্জনা বা ক্ষমা করার মাধ্যমে অপরাধীর সংশোধন করে অর্থাৎ এমন মার্জনা হওয়া উচিত নয় যার ফলাফল ন্যায়ের মানদন্ডে অপছন্দনীয় হতে পারে তাহলে এমন মার্জনাকারী আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাবে। অর্থাৎ ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে এটি অনেক ভালো কথা। আর এর ব্যাখ্যা হলো, এই ক্ষমার ফলে যেন কোন প্রকার ধৃষ্টতা সৃষ্টি না হয়। এই ক্ষমার ফলে যদি কোন অপছন্দনীয় বিষয় সামনে না আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরূপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার কাছে রয়েছে, তিনি যতটা চান তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন।

অতএব মার্জনা এবং ক্ষমা তখন করতে হয় যখন অপরাধী তার নিজ আচরণে স্বচ্ছ থাকে, অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে এই অন্যায় কাজ সে আর করবে না। অনেকেই আছে অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে থাকে আর প্রত্যেকবার অপরাধ করার পর সে ক্ষমা চায়। এমন লোকদের জন্য শাস্তি আবশ্যক। আর সেই শাস্তিও এমন হওয়া উচিত যার ফলে সংশোধনের দিকটি সামনে আসে।

অপর এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, পাপ বা অন্যায়ের শাস্তি ততটাই হওয়া উচিত অন্যায় যতটা করা হয়েছে, কিন্তু কেউ যদি মার্জনা বা ক্ষমা করে আর সেই ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং তাকে পুরস্কৃত করবেন। অতএব কুরআন অনুসারে সব জায়গায় প্রতিশোধ নেয়াও প্রশংসনীয় কাজ নয় আবার সর্বত্র মার্জনা করাও প্রশংসনীয় নয় বরং স্থান-কালভেদে তা করা উচিত। দেখতে হবে যে, পরিস্থিতি কেমন, কিসে কল্যাণ নিহিত, শাস্তিতে না ক্ষমায়। আর শাস্তি বা মার্জনা স্থান-কালভেদে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত, অযৌক্তিক কিছু হওয়া উচিত নয়। এটিই কুরআনের শিক্ষার মূল অর্থ ও মর্ম। এমন নয় যে, কোন নীতিমালা বা আচরণবিধি সামনে না রেখেই শাস্তি দেয়া হবে বা

নিজেদের অধিকার হস্তগত করার জন্য আমরা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে পড়ি অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের একই মানদন্ডে উপনীত হওয়া উচিত। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আমরা যেমন চাই যে, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়া হোক এবং আমাদেরকে যেন ধরপাকড় করা না হয়, আমাদেরকে যেন শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে অন্য কেউ কোন ভুল করলে যার ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, এমন ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে এবং যদি একই ভুল বা অন্যায় বারবার না করে, তাহলে তার সাথেও আমাদের সেই একই ব্যবহার অর্থাৎ ক্ষমা করা উচিত। অবশ্য যদি কোন ভুল বা ভ্রান্তির কারণে জামাত বা জাতিগত স্বার্থহানি ঘটে তাহলে এটি তখন ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি থাকে না বরং ব্যক্তিগত সেই অপরাধ সামাজিক অপরাধে পর্যবসিত হয়, আর তখন এমন অপরাধীদের বিচারিক সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে।

অযথাই ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর জন্য শাস্তির কিছু সীমা-পরিসীমা যেন নির্ধারিত রাখা হয় আর সেই গন্ডির মধ্যে তা থাকা উচিত। আর এটাও দেখতে হবে যে, কল্যাণ বা উপকারিতা কোথায়।

অতএব, এই হলো ইসলামী শাস্তি এবং ক্ষমার হিকমত বা প্রজ্ঞা যে, সংশোধন মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আজকাল, যেসব জাগতিক আইন-কানুন রয়েছে সেখানে আমরা দেখি যে, বিচারিক দন্ডবিধিতে সকল অপরাধেরই শাস্তি দেয়া হয় আর মানুষকে এজন্য কারাবন্দী করে রাখা হয় যেন সংশোধন হয়। কিন্তু এখন এসব উন্নত বিশ্বের বিশ্লেষকরাও লেখা আরম্ভ করেছে যে, অপরাধীরা কারাগার থেকে শাস্তি ভোগ করে বাইরে আসার পর অপরাধের ক্ষেত্রে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে যায় কেননা শাস্তি দাতারা এবং অপরাধীরাও শুধু আইনই মেনে চলে, খোদার ভয় তাদের মাঝে নেই।

যাহোক মু'মিনদের জন্য সাধারণ শিক্ষা হলো তাদের মাঝে ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করার অভ্যাস থাকা উচিত আর অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি এবং অপরাধীর আচরণ ও পরিস্থিতি অনুসারে তা ব্যবহার করা উচিত। চোখ বন্ধ করে সবাইকে ক্ষমা করা হবে এটিও আল্লাহ্ তা'লা চান না আবার রাগ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সবসময় শাস্তি দেয়ার মনমানসিকতা প্রকাশ করা হবে এটিও আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। অবলীলায় ক্ষমা করতে থাকলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর চোখ বন্ধ করে শাস্তি দিতে থাকলেও হিংসা এবং বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর সমাজে ঘৃণার এক প্রাচির গড়ে উঠতে থাকে এবং অশান্তির বিস্তার ঘটতে থাকে।

আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি প্রদান করি তাহলে দেখা যাবে, যাদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় বা অপরাধ করা হয় তারা কঠোরভাবে এই দাবি উত্থাপন করে যে, অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে যেন অন্যদের জন্য এই শাস্তি শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে এবং আর কেউ যেন কোন প্রকার ভুল বা অপরাধ করার দুঃসাহস না দেখায়। আর অপরদিকে অপরাধী বা দোষী ব্যক্তি বলে যে, মার্জনা করা উচিত। বর্তমানে মানবাধিকারের নামে অনেক সংগঠন পৃথিবীতে দেখা যায়। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন কিছু ভালো কাজও করছে সেখানে ক্ষমা করানোর ক্ষেত্রেও তারা অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করে আর সকল অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাতে চায়।

অনুরূপভাবে যেসব অপরাধী ধর্ম এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা বোধ-বুদ্ধি বা সচেতনতা রাখে তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা কর। তাই ক্ষমা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নিজেও বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। তাই তোমরাও বান্দাদের অধিকার প্রদান করে ক্ষমা কর। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পর্যায়েও সবাই যেন নিজের অপরাধীদের ক্ষমা করে আর জামাতীভাবেও যেন সবাইকে ক্ষমা করা হয়। এটি দেখার কোন প্রয়োজন নেই যে, এতে জামাতের ক্ষতি না উপকার হচ্ছে, শুধুমাত্র বান্দাদের অধিকার প্রদান যেন নিশ্চিত হয়। এইভাবে উভয় পক্ষ, যারা বড় বড় সব কথা বলে, হয় তারা অপরাধে অভ্যস্ত হয় নতুবা তারা ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নিতে চায়। যারা অপরাধ করে আর অপরাধের শাস্তি এড়ানোর জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশের বরাতে অন্যায় কথা বলে এরা আসলে স্বার্থপর। এমন লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন অপরাধ বা অন্যায় করে তাহলে এরা কখনো ক্ষমা করে না বরং অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে বৈধ-অবৈধ সকল চেষ্টাই করে থাকে। এখানে এসে তাদের নীতি বদলে যায়। তখন তারা খোদার এই নির্দেশকে ভুলে যায় যে, নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের বেলায়ও তা পছন্দ করা উচিত।

অনুরূপভাবে যারা ক্ষমা করতে চায় না বরং এটি চায় যে, অপরাধীর অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত, তারাও নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হলে ক্ষমা চাইবে এবং বলবে, আসলে ক্ষমা করাই প্রশংসনীয়। ইসলাম এরূপ স্বার্থপরদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার ভিত্তিক সিদ্ধান্ত দেয় যে, যদি নিশ্চিত হয় যে, ক্ষমা করলে সংশোধন হবে তাহলে ক্ষমা করাই উত্তম। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে যদি বোঝা যায় যে, শাস্তি দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তি দেয়া উচিত। যাহোক এটি ইসলামের একটি নীতিগত শিক্ষা। এখন আমরা দৃষ্টি দেই যে, মহানবী (সা.) কতটা ক্ষমা করতেন আর সাহাবীদের এ সম্পর্কে তিনি কি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমি একটু পূর্বে হযরত ইমাম হাসানের দৃষ্টান্ত দিয়েছি যে, তিনি তার এক ভৃত্যের দোষ ক্ষমা

করেছেন।

কিন্তু সেটি ছিল সামান্য এক ত্রুটি। ক্ষমার পরম মার্গ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই যে, শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল যাদের, তিনি (সা.) তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি অন্য কারো বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে কেবল তাকেই ক্ষমা করেননি বরং যারা তাঁর (সা.) নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, হত্যা করেছে তাঁর প্রিয় সন্তানদের, এদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কেননা তাদের সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। হাদীসে বর্ণিত এই ঘটনাটিতে আমরা দেখতে পাই যে,মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে রসূলে করীম (সা.)-এর কন্যা হযরত যায়নাব (রা.) এর ওপরএক ব্যক্তি হাব্বার বিন আসওয়াদ বর্শা দিয়ে আঘাত হেনে হামলা চালায়। তিনি তিনি (রা.) তখন গর্ভবতী ছিলেন আর এই আক্রমণের কারণে তার গর্ভপাত হয়ে যায়, তিনি আহত হন, আর এর ফলে তিনি ইন্তেকালও করেন। এই অপরাধের কারণে হাব্বারের জন্য হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই ব্যক্তি কোথাও পালিয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে, মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার পর হাব্বার মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আমি করুণা ভিক্ষা চাইছি। আপনার ভয়ে আগে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার মার্জনা এবং দয়া আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা অজ্ঞ এবং মুশরিক ছিলাম। খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। আমি আমার সীমালঙ্ঘন স্বীকার করছি। অতএব আমার অজ্ঞতাকে আপনি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখুন আর আমায় ক্ষমা করে দিন। তাই মহানবী (সা.) তার কন্যার এই হত্যাকারীকে ক্ষমা করেন আর বলেন যে, হে হাব্বার! যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এটি খোদার এহসান তথা অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। অতএব, তিনি (সা.) যখন দেখেছেন সংশোধন হয়ে গেছে তখন তিনি নিজের কন্যার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর বিরুদ্ধে কৃত কোন অপরাধের কখনই প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। যেমন ইহুদী যে মহিলা তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তাকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন যদিও কোন কোন সাহাবীর ওপর সেই বিষের মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। এছাড়া ওহুদের যুদ্ধে যে হিন্দা মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযার অঙ্গচ্ছেদ করেছিল এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কান, নাক ইত্যাদি কেটে বিকৃত করে ফেলেছিল এমনকি কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় অন্যান্য মহিলাদের সাথে মিশে গিয়ে সে-ও বয়আত গ্রহণ করে নেয়। তার কিছু প্রশ্নের কারণে মহানবী (সা.) তাকে চিনে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা? সে বলে, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আন্তরিক হয়েই আমি এখন ইসলাম গ্রহণ করেছি। পূর্বে যা ঘটে গেছে তা মার্জনা করুন। মহানবী (সা.) তখন হিন্দাকে ক্ষমা করেন। হিন্দার ওপর তাঁর (সা.) মার্জনার এমন সুগভীর প্রভাব পড়ে যে, তার জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা তার হৃদয়ে বসত গড়ে। এমনকি সেদিন সন্ধ্যায়ই মহানবী (সা.)-কে সে দাওয়াত করে এবং দু'টি ছাগল ভুনা করে খাবার জন্য পাঠিয়ে দেয়এবং একই সাথে এটিও বলে যে, আজকাল পশুর অভাব রয়েছে তাই এই সামান্য উপহার উপস্থাপন করছি। এতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হিন্দার পশুপালে অনেক বরকত দাও। সুতরাং, বলা হয় এই দোয়ার ফলে এত বরকত সৃষ্টি হয়েছে যে, তার পশুপালকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তারপক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না।

মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের ঘটনা সবারই জানা। তিনি (সা.) তার সমস্ত ধৃষ্টতা আর অবমাননা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেন, আর শুধু তাই নয় বরং তার জানাযাও পড়িয়েছেন তিনি (সা.)। হযরত উমর (রা.) যদিও বারবার বলছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তার জানাযা পড়াবেন না। কাব বিন যুহায়ের একজন সুপরিচিত কবি ছিল। কতিপয় কারণে তার ওপরও শাস্তি আরোপ করা হয়। মক্কা বিজয়ের পর তার ভাই তাকে লিখে পাঠায় যে, এখন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতএব সে মদিনা এসে তার পরিচিত এক ব্যক্তির কাছে আশ্রয় নেয় আর মহানবী (সা.)-এর ইমামতিতে ফজরের নামায পড়ে। নামাযের পর রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কাব বিন যুহায়ের তওবার জন্য এসেছে এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। তিনি (সা.) তাকে চেহারায় চিনতেন না। তাই সে বলে, যদি অনুমতি হয় তাহলে তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাকে সামনে নিয়ে আসা হোক। সে তখন বলে যে,হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমিই কাব বিন যুহায়ের। তার সম্পর্কে যেহেতু পূর্বেই হত্যার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল সেই কারণে একজন আনসারী তখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, এ ব্যক্তি ক্ষমার আবেদন নিয়ে এসেছে, তাই তাকে ক্ষমা কর।

এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে সেই ব্যক্তি একটি কাসীদা বা কবিতা পরিবেশন করে। মহানবী (সা.) এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজ চাদর তাকে পরিয়ে দেন। অতএব এই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষমার মান।তিনি (সা.) শুধু ক্ষমাই করতেন না বরং পুরস্কৃত করে, দোয়ার সাথে বিদায় দিতেন। মহানবী (সা.)-এর মার্জনার এমনইঅগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে, আর তাঁর ক্ষমা এত সুমহান পর্যায়ে উন্নীত যে, তা দেখে মানুষ হতবাক হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের ঘৃণ্য গালি দেয়া হয়েছে অনেক, আর মারাত্মক কষ্টও দেয়া হয়েছে, তবুও তাদের জন্য নির্দেশ ছিল

أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

[অর্থাৎ অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল] (সূরা আল্-আ'রাফ: ২০০)। সেই সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সেই মানব,স্বয়ং আমাদের নবী (সা.)-কে বড় ঘৃণ্যভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে, এবং গালি-গালাজ করা হয়েছে নোংরা ভাষায় আর চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা হয়েছে তাঁর প্রতি, কিন্তু মূর্তিমান নৈতিক চরিত্রের সেই ধারক ও বাহক, এর মোকাবিলায় কী করেছেন। তাদের জন্য আশিস কামনা করে দোয়া করেছেন। আর যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল যে, এসব অজ্ঞদেরকে যদি উপেক্ষা কর বা এড়িয়ে চল তাহলে তোমার সম্মান এবং প্রাণকে আমরা নিরাপদ রাখব, আর এই বাজারী বা জগতপূজারীরা কোনভাবেই তা কলুষিত করতে পারবে না। অতএব এমনই হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর বিরোধীরা তাঁর

ক্ষমা করার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে ক্ষমা করা উচিত। আর সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়া যদি আবশ্যক হয় তাহলে প্রজ্ঞার দাবি হলো শাস্তি প্রদান করা। আর এরপর, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে যাওয়া উচিত।

সম্মানকে কলুষিত করতে পারেনি আর নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে।

মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে ক্ষমা এবং মার্জনার কিরূপ মান অর্জনের জন্য নসীহত করেছেন সে সম্পর্কে হাদীসে অনেক ঘটনা দেখা যায়। এখানে দু'একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এক কৃতদাস রয়েছে যে অন্যায় কাজ করে, আমি কি তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারি? রসূলে করীম (সা.) বলেন, তুমি তাকে প্রতিদিন ৭০ বার ক্ষমা কর, অর্থাৎ অগণিত বার তাকে ক্ষমা কর।

অতএব এই হলো দাস এবং অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহারের উন্নত মান যা মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আজকাল দাস-প্রথা নেই আর এক মু'মিন চাকরিজীবির কাছেও এটি প্রত্যাশা করা হয় যে, সেও তার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তা পালন করবে। যেহেতু ক্ষমার নির্দেশ রয়েছে তাই প্রতিটি কাজেই ভুল করতে থাকব, এটি অন্যায় আচরণ। যেমন অন্যান্য স্থানে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, যার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তার সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা উচিত। সুতরাং উভয় পক্ষের জন্যই সিদ্ধান্ত রয়েছে। মালিকের জন্য যেখানে নির্দেশ ছোট ছোট বিষয়ে রাগ করবে না এবং মার্জনা করবে সেখানে অধীনস্ত বা চাকরিজীবি যারা তাদের জন্যও নির্দেশ হলো তোমাদের নিজেদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে চলবে। ক্ষমা এবং মার্জনা সম্পর্কে আমাদেরকে উপদেশ দান করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জামাত প্রস্তুত করা বা গঠন করা বা সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য হলো মুখ, চোখ, কান, নাক এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে তাকওয়া যেন অন্তর্দেশে প্রবেশ করে। তার ভিতরে এবং বাহিরে যেন তাকওয়ার আলো দেখা যায়। উন্নত চরিত্রের মহান দৃষ্টান্ত যেন সে হয়। অনর্থক রাগ এবং ক্রোধ যেন আদৌ না থাকে।

তিনি বলেন, আমি দেখেছি, জামাতের বেশিরভাগ সদস্যদের মাঝে এখনো রেগে যাওয়ার ব্যাধি রয়েছে। ছোট ছোট বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দেয় এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। এমন লোকদের জামাতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। তিনি বলেন, আমার মতে কি অসুবিধা এতে যে,কেউ গালি দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি চুপ থাকবে আর কোন উত্তর দিবে না? প্রত্যেক জামাতের সংশোধন প্রথমে নৈতিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতএব প্রথমত ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে তরবিয়তের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আরএর সবচেয়ে উন্নত রীতি হলো, কেউ দুর্ব্যবহার করলে তার জন্য বেদনাঘন হৃদয়ে দোয়া করা উচিত।

ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে প্রথমে নিজের তরবিয়ত কর, এরপর অন্যেরও তরবিয়ত কর। আর এর জন্য উপায় হলো তার জন্য দোয়া কর, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার সংশোধন করেন। আর হৃদয়ে কোন প্রকার হিংসা এবং বিদ্বেষ পোষণ করে থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা কিছুতেই এটি পছন্দ করেন না যে, নমনীয়তা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা আর মার্জনার মত উন্নত গুণাবলীর স্থানে পাশবিকতা জায়গা নিবে। উন্নত গুণাবলী ধারণ এবং অবলম্বনের ক্ষেত্রে যদি উন্নতি কর তাহলে খুব স্বল্পতম সময়ে তোমরা আল্লাহ্-কে পেয়ে যাবে। তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, সব মানুষের প্রকৃতি এবং ধাত একই রকম হয় না। মানুষের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এ কারণেই কুরআনে এসেছে যে,

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৫)। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের গঠন এবং স্বভাব আর প্রকৃতি বা অভ্যাস অনুসারে আচার ব্যবহার করে। কিন্তু কোন গুণাবলির ক্ষেত্রে কেউ উন্নত হলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সে দুর্বল হতে পারে। একটি গুণ ভালো হলে দ্বিতীয়টি অপছন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু এর আবশ্যকীয় অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, তার সংশোধন হতেই পারে না বা কোন দোষ-ত্রুটি সংশোধন হওয়া সম্ভবই নয়। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করেছেন। কারো কোন গুণাবলী খুবই উন্নত এবং মহান কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে তার ভিতর কিছু দুর্বলতাও রয়েছে।

কিন্তু এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, তার সংশোধনই সম্ভব নয় অতএব উন্নত সব গুণাবলী অবলম্বন করা তার উচিত নয়। মানুষের প্রকৃতি এবং অভ্যাস নিঃসন্দেহে ভিন্ন-ভিন্ন, যাদের মাঝে দুর্বলতা দেখা যায় তাদের মাঝে কিছু ভালো গুণও রয়েছে। এটি নয় যে, কোন ব্যক্তির মাঝে আপাদমস্তক শুধু দোষই বিদ্যমান, আর কোন গুণই নেই। সবারই ভালো গুণও রয়েছে আর দুর্বলতাও রয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে এটি চান যে, খোদার নির্দেশের অনুসরণে আমাদের উচিত নিজেদের সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দেয়া। আর সেসব উন্নত নৈতিক গুণাবলী ধারণ ও অবলম্বন করা উচিত যা এক প্রকৃত মু'মিনের মানদন্ড হয়ে থাকে। সবসময় দুর্বলতা দূরীভূত করার চেষ্টা থাকা উচিত। আর সেইসাথে এই চেষ্টাও করা উচিত যে, আমরা যেন নিজেদের পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারি। আর এর জন্য মহানবী (সা.) যে নীতি বলেছেন তা হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ কর নিজ ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন এসব মানদন্ডে উপনীত হতে পারি। (আমীন)

[কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।]

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৩য় কিস্তি)

‘পরিত্রাণ’ কোন ধর্মের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না

পরিত্রাণের প্রশ্নটা, আপাতঃ দৃষ্টিতে যত সাদামাটাই মনে হোক না কেন, তা ধর্মীয় জগতে শান্তি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

একটি ধর্মের পক্ষে এই ঘোষণা দেয়াটা এক জিনিস যে, যদি কেউ শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে চায় এবং নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, তবে তাকে সেই ধর্মেরই নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে হবেঃ এখানেই সে পরিত্রাণ লাভ করবে। কিন্তু সেই ধর্মের পক্ষে একই সঙ্গে এ ঘোষণা দেয়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস যে, যারা সেই ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করবে না, তারা সকলেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে; তারা খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা-ই করুক না কেন, তারা তাদের স্রষ্টাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে যত বেশী ভালবাসুক না কেন, তারা যত বেশী পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করুক না কেন, তারা নিশ্চিতভাবে চিরস্থায়ী এক জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

যখন এই ধরনের একটা কট্টর, সংকীর্ণমনা এবং অসহিষ্ণু মতাদর্শের কথা উত্তেজনাকর ভাষায় পকাশ করা হয়, বিশেষতঃ, ধর্মীয় ‘জিলোট’ বা গোঁড়া ধর্মান্ধদের দ্বারা, তখন, এটা জানা কথাই যে, তাথেকে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

সাধারণ মানুষ নানা ধরনের হয়ে থাকে। কেউবা শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, এবং সভ্য; এরা এদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আঘাত বা অপরাধের প্রতিক্রিয়া এদের অবস্থান অনুসারেই দেখিয়ে থাক। কিন্তু, ধর্মের প্রতি অনুরাগ পোষণকারী জনসাধারণের একটা বিরাট সংখ্যক অংশ তারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যা-ই হোক না কেন যখন তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তখন তারা মারমুখী হয়ে ওঠে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মগুরু বা যাজক পুরোহিত প্রভৃতি ব্যক্তিদের মনোভঙ্গী তাদের সম্পর্কে যারা তাঁদের বিশ্বাসকে মেনে নিতে রাজি নয়। এমনকি, ইসলামকেও, মধ্যযুগীয় (ভাবধারায়) আলেমরা পেশ করছে এ পরিত্রাণের একমাত্র পথ বলে, এবং এই ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পরে, যে সকল আদম সন্তান ইসলামের গন্ডীর বাইরে থেকে মারা গেছে তারা কেউ পরিত্রাণ পাবে না। খৃষ্টধর্মও এথেকে ভিন্ন কিছু বলে না, অন্য কোনও ধর্মও না, অন্ততঃ আমার জানা মতে। কিন্তু আমি আমার শ্রোতৃবর্গকে এই নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, ইসলামের প্রতি এইরূপ একটা গোঁড়া এবং সংকীর্ণ মতাদর্শ আরোপের কোন সমর্থন নেই ইসলামে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে।

কুরআন করীমের মতে, পৃথবীতে এমন কোন বিশেষ ধর্ম নেই, যা কিনা পরিত্রাণের ওপরে তার একচেটিয়া অধিকার রাখে। যদি নতুন কোন সত্যও অবতীর্ণ হয়, এবং আলোকের নবযুগ সূচিত হয়, আর তা যারা জানতে পারবে না, এবং এই না জানাটার জন্য যদি তাদের নিজেদের কোন দোষ না থাকে, তাহলে তারা এবং যারা কোন ভ্রান্ত আদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েও সাধারণভাবে সত্য ও সৎ জীবন যাপন করার চেষ্টা করে থাকে, তাদেরকেও আল্লাহ্ পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা হয়েছে, কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতেঃ

‘আমরা প্রত্যেক উম্মতের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, তদনুসারে তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন

বিবাদ না করে, তুমি তাদেরকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের ওপরে আছ।' (আল্ হাজ্জ- ২২ ঃ ৬৮)

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মদ সা.-এর ওপরে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে তারা এবং সাবীরা এবং খ্রিষ্টানরা-যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র ওপর এবং পরকালের ওপর এবং সৎকাজ করে, না তাদের কোন ভয় থাকবে, এবং না তারা দুঃখিত হবে।' (আল মায়েদা- ৫ঃ৭০)

আমি আপনাদের স্মরণ করায়ে দিতে চাই যে, 'আহলে কিতাব' কথাটি যদিও সাধারণতঃ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবু তাৎপর্যের দিক থেকে কথাটি ব্যাপকতর অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। কুরআনের যে দাবী ঃ 'দুনিয়াতে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আমরা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি'-সেই দাবীর এবং অন্যান্য আয়াতের (ওপর উদ্ধৃত) পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতিগুলি মাত্র 'পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচার' (তৌরাত ও ইঞ্জিল) কিতাবে উল্লিখিত জাতিগুলিই নয়, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল এবং এটা নিশ্চিত যে, মানবজাতির মঙ্গলার্থে অন্যান্য কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং যে সকল ধর্ম এই দাবী রাখে যে, সেগুলি প্রবর্তিত হয়েছে ঐশী বাণীর ভিত্তিতে, সেগুলিকে 'আহলে কিতাবের' অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে।

এ ছাড়া কুরআন পাকে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'সাবী'-যা দ্বারা এ বিষয়টি থেকে সকল সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে। 'সাবী'-শব্দটি আরবরা সেই সকল অনারব এবং অসেমেটিক ধর্মগুলির জন্য ব্যবহার করতো যাদের নিজেদের জীবনের ঐশী ধর্মগ্রন্থ ছিল। সুতরাং ঐশীবাণীর ভিত্তিতে প্রবর্তিত দর্শণসমূহের অনুসারীদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, যদি তারা নবাগত ধর্মের আলো চিনতে সত্যিসত্যিই অপারগ হয় এবং সত্যতার সঙ্গে ও সঠিকভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের মূল্যবোধসমূহকে পালন করে, তাহলে খোদা তা'লার তরফ থেকে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা পরিত্রাণ থেকেও বঞ্চিত থাকবে না।

পবিত্র কুরআন মু'মিনদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তা তারা ইহুদী, খৃষ্টান বা সাবী যে দলেরই হোক না কেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা হচ্ছেঃ

'তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (আল্ বাকারা ২ঃ৬৩)

'এবং যদি তারা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাদের প্রভুর নিকট থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতো, তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের উর্ধ্বদেশ থেকেও এবং তলদেশ থেকেও (নেয়ামতসমূহ) ভোগ করতো। অবশ্য, তাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক যে কাজকর্ম করছে তা অতিশয় মন্দ।' (আল্ মায়েদা- ৫ঃ৬৭)

যারা ইসলামের গন্ডীভুক্ত নয় তাদের সবাইকে নির্বিচারে নিন্দা ভর্ৎসনা করার বিরুদ্ধে মুসলমানদের পবিত্র কুরআন নির্দেশ দেয়।

'তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন অনেক দলও আছে যারা (তাদের অঙ্গীকারে) কায়েম আছে, তারা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করে এবং তারা (তাঁর সম্মুখে) সিজদা করে। তারা আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অন্যায় অসঙ্গত কাজে বারণ করে, এবং সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ, এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা যে কোন সৎকাজই করুক না কেন, তাদেরকে তাঁর প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।' (আলে ইমরান- ৩ঃ১১৪-১১৬)।

সম্প্রতিকালে, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে একটা বিরাট ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা হচ্ছে ইসলামের মতে ইহুদীরা সবাই জাহান্নামী। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা তা আমি প্রমাণ করেছি কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতগুলির মাধ্যমে। এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকেও তা প্রমাণিত হয়।

'এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা সত্যের সাহায্যে হেদায়াত পাচ্ছে এবং তার সাহায্যে ন্যায় বিচার করছে।' আ'রাফ- ৭ঃ১৬০)

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি সাধন

পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেবল মুসলমানরাই যে অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের প্রতি উপদেশ দিচ্ছে এবং সুবিচার করছে তা নয়, বরং এমন আরও অনেক জাতি আছে যারা অনুরূপ কাজ করছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আজ পৃথিবীর সকল ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে অপরাপর ধর্মবিশ্বাসগুলোর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী জাতিগুলোর প্রতি অনুরূপ উদার মনোভাব, মহানুভবতা এবং মানসিক সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে না পারলে ধর্মীয় শান্তি কোন ক্রমেই অর্জিত হবে না। পবিত্র কুরআন সাধারণভাবে, দুনিয়ার সকল ধর্ম সম্পর্কেই একথা বলেঃ

'এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একটা দল আছে যারা (লোকদেরকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং তদ্বারা ন্যায় বিচার করে'। (আল আ'রাফ ৭ঃ১৮২)

সার্বজনীনতার ধারণা

স্মরণাতীত কাল থেকেই বহু দার্শনিক এমন একটা সময়ের স্বপ্ন দেখে আসছেন, যখন সমগ্র মানবজাতি একই পরিবার হিসেবে একই পতাকার তরে সমবেত হবে। মানবজাতিকে একীভূত করার এই ধারণা বা কনসেপ্ট শুধু যে রাজনৈতিক

চিন্তাবিদদের দ্বারাই সমর্থিত বা গৃহীত হয়েছে তা নয়, এবং এই ধারণাটি একইভাবে অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারাও সমর্থিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাটির প্রতি ধর্ম যত বেশী গুরুত্ব সহকারে জোর দেয়া হয় ততটা জোর আর কোথাও দেয়া হয় না।

ইসলাম যদিও বাহ্যতঃ, সাধারণ অর্থে, অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে (যেগুলির কোন কোনটা বিশ্বকে শাসন করার অতি উচ্চ অভিলাষ রাখে) এ ব্যাপারে অভিন্ন অভিমতই পোষণ করে, তথাপি ইসলামের অবস্থান তার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ঐ সকল উচ্চাভিলাষী দাবী থেকে সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র। এই বিতর্কিত বিষয়টি বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তাছাড়া, এক্ষেত্রে এই বতর্কে অতীর্ণ হওয়ারও অবকাশ নেই যে, সমগ্র মানবজাতিকে একই ঐশী পতাকার তলে সমবেত করার জন্যে আসলে কোন ধর্মকে আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমতা দান করা হয়েছে। যদি দুটি, তিনটি বা চারটি শক্তিশালী ধর্ম, যেগুলির প্রত্যেকটির দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে, একইসঙ্গে সার্বজনীন ধর্ম হওয়ার দাবী করে, তাহলে কি তা সকল মানুষের মনের মধ্যে একটা বাজে বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার জন্ম দিবে না? বিশ্ব শাসনের জন্য তাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংগ্রাম কি তখন বিশ্ব শান্তির জন্য একটা সত্যিকারের দারুণ হুমকী স্বরূপ দেখা দিবে না?

ধর্মগুলোর পক্ষে বিশ্বজোড়া এই জাতীয় আন্দোলনগুলো নিজেদের জন্যই দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে এই বিপদও দেখা দিচ্ছে যে, ঐ আন্দোলনগুলো চলে যাচ্ছে এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন, ধর্মান্ধ এবং অসহিষ্ণু নেতৃত্বের হাতে। যার অর্থ হচ্ছে, এ ব্যাপারে যেসব ঝুঁকির আশংকা আছে, তা বহু গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা শুধু একাডেমিক বা আলোচনার পর্যায়ে না থেকে সত্যি সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলনরূপে দেখা দিচ্ছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ, একটা অপপ্রচার চালানো হয় যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানেই বলা প্রয়োগ করে থাকে। এই ধরনের কথা শুধু যে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরাই বলে থাকে তা না, বরং তা মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন মুসলিম উলামার কাছ থেকেও শোনা যায়।

যদি কোন ধর্ম আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে অপরাপর ধর্মগুলিরও এই অধিকার জন্মাবে যে, তারাও সেক্ষেত্রে, একই অস্ত্রে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

অবশ্য, আমি এ ব্যাপারে একমত নই এবং আমি তা জোরের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করি যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করার পক্ষপাতি। তবে, বিষয়টা নিয়ে আমি পরে আলোচনায় ফিরে আসবো।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই যে, পৃথিবীর কোনো ধর্মের এই ধরনের দাবীর পিছনে কোন যৌক্তিকতা আছে কি না। কোনও একটি ধর্ম- তা সে ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম অথবা অন্য যে ধর্মের কথাই আপনি বলুন না কেন, তা কি তার বাণীর ক্ষেত্রে সার্বজনীন হতে পারে? যে সার্বজনীনতার অর্থ এই যে, তার বাণী-বর্ণ-গোত্র জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য? তাহলে, সেক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয়, উপ-জাতীয়, জাতীয় এতিহ্যের অধিকারী, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং সাংস্কৃতিক ধারা ও কর্মকান্ডের অধিকারী লোকদের অবস্থা কি হবে?

ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বজনীনতার ধারণাটা এমন হওয়া চাই যে, তা শুধু ভৌগলিক ও জাতীয় সীমারেখাকেই অতিক্রম করবে না, তাকে সময় বা কালের সীমাকেও অতিক্রম করতে হবে। তাহলে, যে প্রশ্নটা দেখা দিবে, তা হচ্ছেঃ কোনো ধর্ম কি চিরন্তন হতে পারে? অর্থাৎ কোনো ধর্মের শিক্ষা কি সমান কার্যকারিতা নিয়ে এই যুগের মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে, এবং হাজার বছর পূর্বের কিংবা হাজার বছর পরের মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে? এমনকি, যদি কোন একটা ধর্মকে পৃথিবীর গোটা মানবজাতি গ্রহণ করে নেয়ও, সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠবে যে, কি করে সেই ধর্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে?

এক্ষেত্রে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য হবে, উল্লিখিত সমস্যাবলীর সমাধান কীভাবে সম্ভব, তা তাদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষানুযায়ী উপস্থাপন করা। যাহোক, আমি ইসলামের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলোর যে ইসলামী উত্তর তা আমি সংক্ষেপে পেশ করতে চাই।

(চলবে)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর কানাডা সফর-২০১৬

পর্ব-১

ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের এক অসাধারণ নিদর্শন

মুকাররম আব্দুল মাজেদ তাহের
এডিশনাল উকিলুত তবশীর, লন্ডন

৩ অক্টোবর, ২০১৬ :

আজকের এই দিন জামাতে আহমদীয়া কানাডার জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কেননা, এদিনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কানাডায় শুভ পদার্পণ করেছেন। তাছাড়া এই সফর এইদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে, জামাতে আহমদীয়া কানাডা এ বছর তাদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে আর এই উপলক্ষে জলসায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতারও আয়োজন করা হয়েছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) কানাডায় ২০০৪ সালের ২১ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত প্রথম সফর করেন। ২য় সফর ৪ জুন থেকে ৬ জুলাই ২০০৫ এ হয়েছিল। এরপর ২০০৮ সালে হুযূর আনোয়ার (আই.) আমেরিকা সফর সমাপ্ত করার পর ২৪ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত কানাডায় সফর সম্পন্ন করেন। এরপর ২০১২ সালে জলসা সালানা আমেরিকায় অংশগ্রহণের পর ৩ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই আর ২০১৩ সালে ১৫ মে থেকে ২৭ মে পর্যন্ত হুযূর আনোয়ার (আই.) কানাডা সফর করেছিলেন।

লন্ডন বিমান বন্দর অভিমুখে যাত্রা

হুযূর (আই.) কানাডায় ৬ষ্ঠ বার সফরের জন্য ৩ অক্টোবর রোজ সোমবার ১১টা ১০ মিনিটে নিজ বাসস্থান থেকে বের হয়ে আসেন। হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে বিদায় জানানোর জন্য জামাতের পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণ সকাল থেকে লন্ডনের ফযল মসজিদের বাহিরের প্রাঙ্গনে সমবেত হতে থাকে। হুযূর আনোয়ার (আই.) হাত নাড়িয়ে সবাইকে আশিসপূর্ণ সালাম দিয়ে ইজতেমায়ী দোয়া করেন। প্রায় ১২টা ৫ মিনিটে হুযূর আনোয়ার (আই.) লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরের ৫ নম্বর টার্মিনালে পৌঁছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বিমানবন্দরে আগমনের পূর্বেই মালপত্র প্লেনে তোলা ও ইমিগ্রেশন এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিমানবন্দরে হুযূর আনোয়ার (আই.) কে বিদায় জানানোর জন্য মোকাররম সৈয়্যদ মনসুর আহমদ শাহ্ সাহেব (নায়েব আমীর ইউকে জামাত), মোকররম আখলাক আহমদ

আনজুম সাহেব (ওকালত তবশীর) এবং মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা আউফাস আহমদ সাহেব, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইউকে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগের অফিসার মোকাররম মেজর মাহমুদ আহমদ সাহেব তার সিকিউরিটি টিম নিয়ে কাফেলার সাথে এসেছিলেন। তারা সবাই আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরের সাথে মোসাফাহ্ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) স্পেশাল লাউঞ্জে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। তারপর প্রায় দুপুর ১টার সময় বিমানে আরোহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হুযূর আনোয়ার (আই.) এর গাড়ী বিমানবন্দরের সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর প্রোটোকল অফিসার হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে বিমানে নির্ধারিত আসনে বসিয়ে দিয়ে তারপর ফেরৎ আসেন।

হুযূর (আই.)-কে টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় স্বাগত জানানো হয়ঃ

বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান BA093 ১:৩০ মিনিটে একটানা উড়াল সফর শেষ করে টরন্টোর স্থানীয় সময় দুপুর ৩টা ৪০ মিনিটে টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। কানাডার সরকার হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে স্টেট গেষ্ট (State Guest) এর সম্মান প্রদান করে। এরোপ্লেনের দরজায় মোকাররম মালেক লাল খান সাহেব (ন্যাশনাল আমীর কানাডা জামাত), মোকাররম ডা. আসলাম দাউদ সাহেব (নায়েব আমীর কানাডা) হুযূর আনোয়ার (আই.) কে স্বাগত জানান। এবং তারা হুযূরের সাথে মোসাফাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। গ্লোবাল অফিসার ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি ছাড়াও বৃটিশ এয়ারওয়েজ এর চীফ এক্সিউকিটিভও হুযূর আনোয়ার (আই.) কে স্বাগত জানান। এয়ারপোর্ট পুলিশের সদস্য যারা ডিউটিতে রয়েছেন, এই সুযোগে তারাও হুযূর আনোয়ার (আই.) এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং হুযূর এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা ডিউটিতে ছিলেন। ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেন। এয়ারপোর্টের বাইরে ১০টি মোটর সাইকেলের সুসজ্জিত একটি বহর আর টরন্টো পুলিশের একটি স্কোয়াড অপেক্ষারত ছিল। ৪:৪০ মিনিটে হুযূর আনোয়ার (আই.) এয়ারপোর্ট থেকে রওয়ানা হন। পুলিশ দ্বারা সজ্জিত মোটর সাইকেল স্কোয়াড হুযূর (আই.)-এর কাফেলাকে (Escort) করে রাষ্ট্রীয় অতিথির যথাযথ মর্যাদার সাথে গন্তব্যে

নিয়ে যায়। ২/৩টি মোটর সাইকেল হুযূরের গাড়ীর সামনে ছিল আর বাকীগুলো ডানে-বায়ে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে কাফেলার রাস্তা অবাধ করায় নিয়োজিত ছিল।

এয়ারপোর্ট থেকে কানাডা জামাতের কেন্দ্র 'বায়তুস্ সালাম এবং পিস্‌ভিলেজ' এর দূরত্ব প্রায় ২৬ কি.মি.। যখন বহরটি York রিজিয়নে পৌঁছায় (যেখানে পিস্‌ভিলেজ অবস্থিত) তখন সেখানকার স্থানীয় পুলিশ ট্রাফিক সিগন্যাল কন্ট্রোলের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর যথারীতি হুযূরের বহরের চলার পথ উন্মুক্ত ও অবাধ করতে থাকে। এই পুলিশ দলও বহরেরই অংশ হয়ে যায় আর হুযূর আনোয়ার (আই.) এর কাফেলার সাথে গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত কর্তব্যরত ছিল।

কানাডার আহমদীয়া জনপদ– পিস্‌ভিলেজে হুযূর (আই.)-এর শুভাগমনঃ

বায়তুস্ সালাম, আইওয়ানে তাহের (জামাতে আহমদীয়া) এবং দারুল আমান (Peace-village)কে খুব সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। প্রিয় হুযূরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জামাতের সদস্য-সদস্যা ও ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা দুপুর থেকেই Peace-village এর বিভিন্ন গলি ও সড়ক পথে জমায়েত হওয়া শুরু করে দেয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর আগমনের সময় এর সংখ্যা আট হাজারের চেয়েও বেশী ছিল। টরন্টো ছাড়াও কানাডার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরের সাক্ষাত লাভের জন্য জামাতের সদস্যরা ছুটে আসেন। আবার কিছু লোক দূর-দূরান্তের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন। যেমন– বৃটিশ কলাম্বিয়া থেকে আগত সদস্যরা সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এসেছেন।

উষ্ণ আন্তরিক সংবর্ধনা

হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেহমানরাও উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকা, বৃটেন, জামাইকা, ব্লেইজ, ও ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, নরওয়ে ও সুইডেন থেকে জামাতের সদস্যরা জলসায় যোগদান করেন। এই সব সদস্যরা আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরকে এক পলক দেখার জন্য উদগ্রীব ছিল। পুরুষ-মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদের অসম্ভব এক ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যারা কিনা তাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরের আলোকোজ্জ্বল চেহারা এক পলক দেখার জন্য ব্যাকুল মনে অপেক্ষা করছিল। এর পূর্বে ২০১২ সালেও হুযূর আনোয়ার (আই.) টরন্টোতে আগমন করেছিলেন। এখন এর প্রায় চার বছর পর, তাঁর পবিত্র পা কানাডার মাটিতে পড়ল। অনেক পরিবার এমন ছিল যারা জীবনে প্রথমবার এত নিকট থেকে হুযূরকে দেখছিলেন যে, তাদের কাছে প্রতীক্ষিত এ মুহূর্তটি ছিল পরম মূল্যবান। ৫টা ৩০ মিনিটে যখন হুযূরের গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীসহ জেন ষ্ট্রীট থেকে আহমদীয়া এভিন্যুতে প্রবেশ করে তখন হুযূরের গাড়ী দেখা মাত্রই, 'আসসালামু আলাইকুম, হুযূর! আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান ওয়া মারহাবা' এবং 'নারায়ে তাকবীর' এর উচ্চকিত ধ্বনী সমস্ত পরিবেশে

প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছিল। সড়কের এক পাশে পুরুষ এবং অন্য পাশে মহিলারা হাত উচিঁয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরকে স্বাগতম জানাচ্ছিলেন, আর ভিড়ও এত বেশী ছিল যে পা রাখার ঠাঁইও পাওয়া যাচ্ছিল না। হুযূরের গাড়ী চলছিল ধীর গতিতে। তিনি হাত নেড়ে সালাম এবং নারার জবাব দিচ্ছিলেন। হুযূর তাঁর বাসভবনের সামনে পৌঁছে যখনই গাড়ী থেকে বের হন তখন অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক এক দৃশ্য ভেসে ওঠে। হুযূরের পবিত্র চেহারার ওপর দৃষ্টি যেতেই বাঁধ ভাঙ্গা আবেগে তারা খেলাফতে আহমদীয়া-জিন্দাবাদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস–জিন্দাবাদ নারা লাগাতে থাকে। পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ সবার চোখ আনন্দের আতিশয্যে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। যারা হুযূরকে জীবনে প্রথমবার চোখের সামনে দেখছে তাদের জন্য আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছিল। হুযুরের বাসস্থানের বাইরে রাস্তার একপাশে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যগণ, রিজিওনাল আমীর, স্থানীয় আমীর এবং মুরব্বীগণ দাঁড়িয়েছিলেন তারা সবাই তাঁর শুভাগমনে অভিনন্দন জানান। এ সময় কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্য Deb Schulte সাহেব প্রাদেশিক সংসদ সদস্য ও পরিবহন মন্ত্রী Steven Del Duca সাহেব হুযুরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ভগান সিটির মেয়র Maurrio Bevilacqua সাহেব এবং পিসভিলেজ এলাকার কাউন্সিলর Marilyn Lafrate সাহেবাও উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই হুযূরকে অভিনন্দন জানান। তারপর হুযূর কিছুক্ষণের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানে অবস্থান করেন।

হুযুর (আই.) এর শুভাগমন : হেলিকপ্টারের মাধ্যমে মিডিয়া কভারেজ

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর আগমনের পূর্ব থেকেই পিসভিলেজ অঞ্চলে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া টরন্টো ষ্টার, গ্লোবাল নিউজ, সি পি ২৪ এবং সি টিভি-এর রিপোর্টার ও প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিল। আর তাদের হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পিস্‌ভিলেজ থেকে হুযূরকে অভ্যর্থনার লাইভ কভারেজ দিয়ে যাচ্ছিল। মিডিয়ার দুটি হেলিকপ্টার পিসভিলেজের ওপর একটানা ৪০ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণরত ছিল আর অভ্যর্থনার সঠিক দৃশ্য কভারেজ দিয়ে যাচ্ছিল। বিকেল ৫ টা ২৫ মিনিটে হুযূর আনোয়ার (আই.) নিজ বাসস্থান থেকে বাইরে আসেন। সেই সময় পর্যন্তও ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথারীতি কভারেজ দিয়ে যাচ্ছিল। এরপর হুযূর 'বায়তুস্ সালাম' মসজিদে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা পড়ান। নামাযের পর তিনি নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

পিসভিলেজ ও বায়তুয্ যিকর-এর আশেপাশের এলাকায় এক হাজারেরও বেশী আহমদী পরিবার বসবাস করে। এ এলকার সড়ক এবং অলি-গলির নামকরন আহমদীয়া জামাতের খলীফাগণ এবং বিভিন্ন বুযুর্গগণের নামে করা হয়েছে, যেমন– আহমদীয়া এভিনিউ, নাসের ষ্টীট, তাহের ষ্ট্রীট, মাহমুদ ক্রিসেন্ট, নূরুদ্দীন কোর্ট, জাফরুল্লাহ্ খান ক্রিসেন্ট, আব্দুস সালাম ষ্ট্রীট, ইত্যাদি।

মনোরম দৃশ্য এবং অনুপম নির্মাণশৈলীতে সমৃদ্ধ বায়তুস সালাম ও এর আশেপাশের আহমদীয়া বসতি দেখে কাদিয়ান এবং রাবওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে যাবেই। (সংক্ষেপিত) (চলবে)

(তথ্য সূত্র : দৈনিক আল ফযল, ১৯ শে অক্টোবর, ২০১৬, রাবওয়া),

ভাষান্তর : **মওলানা মোহাম্মদ সালেহ্**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কল্যানময় তাহরীক তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী

মোহাম্মদ আরিফুর রহিম
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়া জামাতের খলীফাগণের কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তাদের সমস্ত বক্তৃতায়, খুতবা এবং কথায় ও কর্মের মাধ্যমে উজ্জ্বলাকারে দৃশ্যমান। তাঁদের প্রত্যেকেরই আপন কর্মের ঔজ্জ্বল্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এই পংক্তিরই প্রতিফলন ঘটে থাকে।

দিল্ মে য়্যাহী হ্যাঁয় হরদম তেরা সহীফা চুমুঁ–
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যাঁয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর প্রারম্ভিক তাহরীকগুলোর মধ্যে একটি হলো তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী। এটি এমন এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার জ্যোতির্ময়তা দিন দিনই বেড়ে চলছে। তিনি (রাহে.) নিজেই ছোট বেলায় পবিত্র কুরআন মুখস্ত অর্থাৎ হিফ্য্ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া রূহানী ভাবে তাঁর (রাহে.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, উঠা-বসা, ব্যবহারিক জীবনযাত্রা সবই কুরআনের নূরে ভরপুর ছিল। তাঁর (রাহে.) প্রত্যেকটি তাহরীক ও বক্তৃতা থেকে এই ঘোষণা নির্গত হতো যে, "আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন"। তাঁর (রাহে.) কুরআনের প্রতি ভালোবাসা যেন আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল।

তালিমুল কুরআন একটি ইলাহী তাহরীক

ইলাহী তাহরীক বলতে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে খলীফাদের হৃদয়ে কোন বিশেষ কাজের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করে দেওয়াকে বুঝায়, আর তখনই খলীফা এই কাজ বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একটি স্থিরকৃত টার্গেট দিয়ে থাকেন। আর তখনই এটিকে জামাতের পক্ষ থেকে ইলাহী তাহরীক নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অতঃপর এই তাহরীকের ফলে অধিক কল্যাণরাজি অর্জন হয়ে থাকে। আর এটি একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এ সকল নেযাম বা ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের মাধ্যমে জারি হয়ে থাকে।

১৯৬৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর তাহরীক করেন। তখন থেকেই এর কল্যাণরাজী প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়ে আজও আহমদীগণ এটি থেকে উপকৃত হচ্ছেন। এই তাহরীকের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)কে একটি রূহানী দৃশ্যও দেখান। যাতে তিনি (রাহে.) দেখেন যে, সমস্ত জমিন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নূরে আলোকিত হয়ে ছেয়ে আছে আর সেই নূর "বুশরা লাকুম" এর 'মহান সু-সংবাদ' ইলহামী শব্দে অঙ্কিত হয়েছে। এ তাহরীকের বিষয়ে মহান সুসংবাদের উল্লেখ করতে গিয়ে হুযুর (রাহে.) ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৬ সালের জুমুআর খুতবায় বলেন,

"যে নূর আমি ঐ দিন দেখেছি, সেটি কুরআন করীমের নূর ছিল, যেটি তালিমুল কুরআন এবং ওয়াকফে আরযী স্কীমের মাধ্যমে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কুরআন শিক্ষাকে যুগ খলীফার সবচেয়ে গুরুত্ববহ কাজ বলে আখ্যায়িত করেন এবং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তালিমুল কুরআনের শুভসূচনা করেন আর জামাতসমূহকে এই টার্গেট প্রদান করেন যে, এমন কোন শিশু-কিশোর যেন না থাকে, যে কুরআন নাযেরা পড়তে পারে না। অতঃপর তিনি (রাহে.) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালের জুমুআর খুতবায় বলেন যে, 'এই বিষয়ে প্রাথমিক যে পরিকল্পনা আমি জামাতের সামনে রাখতে চাচ্ছি তা হলো,

জামাতে আহমদীয়া লাহোরের সকল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন নাযেরা পড়ানো-শেখানোর কাজ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া করবে। করাচি জামাতে শিশুদের কুরআন করীম নাযেরা পড়ানোর কাজ 'মজলিস আনসারুল্লাহ্' এর ওপর ন্যস্ত করছি। শিয়ালকোট জেলার আশপাশের জামাতগুলোতে এই কাজ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া করবে। ঝং জেলায় যে জামাতসমূহ আছে সেখানকার ছেলে-মেয়েদের কুরআন নাযেরা পড়ানোর কাজ মজলিস আনসারুল্লাহ্ এর উপর ন্যস্ত করছি। এছাড়া অন্যান্য যে জামাতসমূহ রয়েছে সেগুলোতে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের এই চেষ্টা হওয়া উচিত যে, দুই তিন বছরের মধ্যে আমাদের কোন ছোট ছেলে-মেয়ে এমন থাকবে না যারা কুরআন নাযেরা পড়তে পারে না। এই পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রোগ্রাম তৈরি করুন এবং এক সপ্তাহ পর পর আমাকে রিপোর্ট প্রদান করুন।" (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫)

কুরআন শেখানো সম্পর্কিত এই তাহরীকের দেড় মাস পর হুযূর (রাহে.) এই কাজকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য 'ওয়াকফে আরযী'-র তাহরীক করেন। একই বছর ২৪ জুন থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সাল

কমপক্ষে তিনমাস একাধারে কুরআনের নূরের ওপর খুতবা প্রদান করেন যা পরবর্তীতে "আনওয়ারে কুরআন" নামে প্রকাশিত হয়েছে। হুযূর (রাহে.) জামাতের কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষ করে জেলা আমীরগণকে এ তাহরীক সফল করার জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট করে ১লা জুলাই ১৯৬৬ সালের খুতবায়ে জুমুআয় বলেন, "সুতরাং আমি আপনাদেরকে আবারও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করছি যে, আপনারা আপনাদের মূল উদ্দেশ্যের দিকে মনোযোগী হউন এবং নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছান যেন জামাতের এমন কোন সদস্য না থাকে, ছোট অথবা বড়, পুরুষ অথবা মহিলা, যুবক অথবা বাচ্চা, যে কুরআন করীম নাযেরা পড়তে পারে না। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯)

হুযূর আনোয়ার (রাহে.) তিন বছর ধরে এ তাহরীকের রিপোর্ট নেন এবং ২৮ মার্চ ১৯৬৯ সালের জুমআর খুতবায় মরকযী ব্যবস্থাপনা বাড়াতে এডিশনাল নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী নামে নতুন কর্ম বিভাগ চালু করেন। যার আলাদা দপ্তর ১লা মে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মজলিসে মুসীয়ান এবং তালিমুল কুরআন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৬ সালে আঞ্জুমানে মুসীয়াঁ ও মুসীয়াত প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা করেছিলেন। তিনি (রাহে.) বলেন, "মুসীয়ান সাহেবানদের পবিত্র কুরআনের সাথে একটি গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন করীম শেখা, কুরআন করীমের আলোয় আলোকিত হওয়া, কুরআন করীমের বরকত ও ফজলের উত্তরাধিকারী হওয়া, একই ভাবে কুরআন করীমের নূর বিকশিত করার দায়িত্বও এ সকল লোকদের ওপর বর্তায়।

এজন্য আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর তাহরীককে মুসী সাহেবানদের দায়িত্বাবলীর সাথে যুক্ত করে দেয়া হোক এবং এ সকল কাজ তাদের ওপর ন্যস্ত করা হোক। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৬)

হুযূর আনোয়ার (রাহে.) ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৯ সালের জুমুআর খুতবায় তালিমুল কুরআনের দায়িত্বাবলী মুসীয়ানদের ওপর ন্যাস্ত করতে গিয়ে বলেন, "খোদা চান যে, পবিত্র কুরআন পড়া এবং পড়ানোর মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করুন।"

একই খুতবায় তাদের ওপর ন্যস্ত কাজের উল্লেখ করতে গিয়ে হুযুর বলেন, "প্রথমত মুসীগণের সদর ও নায়েব সদরের দায়িত্ব হলো তারা স্ব স্ব এলাকার মুসীদের রিপোর্ট নিয়ে একমাস পর আমাকে এ বিষয়ে অবগত করবেন যে, কতজন মুসী কুরআন করীম নাযেরা জানে। যে সকল মুসী কুরআন নাযেরা জানে তাদের মধ্য থেকে কতজন মুসী কুরআন তরজমা জানে, যে সকল মুষী কুরআন তরজমা জানে তাদের মধ্য থেকে কতজন কুরআনের তফসীর শেখার চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় দায়িত্ব প্রত্যেক মুসী কুরআন পড়তে পারে কিনা। আর তৃতীয় দায়িত্ব আজ আমি ঐ সকল মুসীদের ওপর ন্যস্ত করতে চাই যারা কুরআন পড়তে জানে। তারা ২ জন এমন বন্ধুকে কুরআন করীম শেখাবে যারা কুরআন পড়তে জানে না। আর এই কাজ একটি নেযামের মাধ্যমেই হবে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নাযারাতকে অবগত করতে হবে"। (খুতবাতে নাসের, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

একই খুতবাতে হুযূর (রাহে.) মজলিস আনসারুল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তারা যেন নিজেরা কুরআন শিখে এবং তাদের অধিনস্তদের শেখায়। তিনি (রাহে.) খোদ্দাম ও লাজনাদেরকেও কুরআন শেখানোর দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। আর এটি বাস্তবায়নের জন্য ছয় মাস সময় নির্ধারণ করেছিলেন, কিন্তু এরপরে ২০ জুন ১৯৬৯ সালের জুমুআর খুতবায় ছয় মাসের পরিবর্তে দেড় বছর সময় নির্ধারণ করেদেন।

তাহরীকে তালিমুল কুরআন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুযূর (রাহে.) ফজলে ওমর দরসুল কুরআন ক্লাস নাযারাত তালিমুল কুরআনের সাথে সংযুক্ত করে দেন। যেটি নাযারাত ইসলাহ ইরশাদ এর মাধ্যমে ১৯৬৪ সালে শুরু হয়েছিল। তালিমুল কুরআনের জন্যই হুযূর আনোয়ার ২০ জুন ১৯৬৯ সালে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ১ম খন্ড পড়ার তাহরীক করেছিলেন, যেটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। একইভাবে হুযূর (রাহে.) ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে করাচীতে জামাতের সদস্যদেরকে সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্ত করা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাহরীক করেছিলেন।

তাহরীক ওয়াকফে আরযী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর যুগে এক বিশেষ মুহূর্তে ওয়াকফে আরযীর তাহরীক করা হয়েছিল। শুদ্ধি আন্দোলনের সময় তিন মাস-তিন মাস করে ওয়াকফ করার তাহরীক করা হয়েছিল। কিন্তু ওয়াকফে আরযী তাহরীকের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা খেলাফতে সালেসার সময় জারি করা হয় এবং নাযারাত কায়েম করা হয়। সুতরাং ১৮ই মার্চ ১৯৬৬ সালের জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এই তাহরীকের ঘোষণা করেন। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২)

হুযূর (রাহে.) খুতবায়ে জুমআয় তাহরীকের ঘোষনা করতে গিয়ে বলেন, "সার্বজনীনভাবে সময়ের কুরবানীর দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, আর এ জন্যই জামাতে এই তাহরীক করছি যে ঐ সকল বন্ধু যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছে তারা বছরে ২ সপ্তাহ থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মের সেবার জন্য ওয়াকফ করুন, আর তাদেরকে জামাতের বিভিন্ন কাজের জন্য যেখানে যেখানে পাঠানো হবে সেখানে সে নিজ খরচে যাবে এবং তার ওয়াকফকৃত সময়ের যতটুকু অংশ তাকে সেখানে রাখা হবে নিজের খরচে থাকবে। আর যে কাজ তার ওপর ন্যস্ত করা হবে তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। আমি জানি কিছু মানুষ আর্থিক কারণে অনেক দূরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এজন্য যে সকল বন্ধু দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য আমার এই তাহরীকে ওয়াকফ করবে, তারা আবেদনের সাথেই লিখে দিবেন যে, আমি একশত মাইল বা দুইশত মাইল বা পাঁচশত মাইল পর্যন্ত দূরত্বে নিজ খরচে যেতে পারবো, অর্থাৎ সে তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী উল্লেখ করবে যে, আমি নিজ পক্ষ থেকে এতটুকু যাওয়ার সামর্থ্য রাখি, তাকে সেই অনুযায়ী জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩)

হুযূর (রাহে.)-এর দিকনির্দেশনার আলোকে তাহরীকে ওয়াকফে আরযী কাজ শুরু করে দেয় এবং খালিদে আহমদীয়াত হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ-এর ইনচার্জ নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৬৯ সালে এটিকে

পূর্ণাঙ্গীন নাযারাতের রূপ প্রদান করা হয়। আর তখন তিনিই প্রথম এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী নিযুক্ত হন এবং আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন, প্রত্যেক আহমদী ওয়াকফে আরযী করুন

হুযূর (রাহে.) জামাতের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পর্ক সদস্যদেরকে এটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাহরীক করেন। সুতরাং, তিনি (রাহে.) জামাতের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তাগণ, মুসীয়ান, ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা, উকিল নির্বিশেষে সকলের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন যে, ওয়াকফে আরযী করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য ফরজ। তিনি (রাহে.) ১৬ আগষ্ট ১৯৬৯ সালের খুতবায়ে জুমুআয় বলেন, "মুরব্বীগণের এবং সাধারণ কর্মকর্তাগণের উচিত বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত সে যেন নিজেকে এবং নিজের ভাইদেরকে ওয়াকফে আরযী করতে উৎসাহিত করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি একটি কুরবানীর পথ এবং এই পথ খুবই কষ্টকর। কিন্তু এটিতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরবানীর পথ অবলম্বন করা ব্যতীত আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব না।" (খুতবাতে নাসের, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০২)

ওয়াকফে আরযীর প্রধান উদ্দেশ্য কুরআন করীম শেখানো

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ২৮ মার্চ ১৯৬৯ সালের জুমুআর খুতবায় বলেন, "তাহরীকে ওয়াকফে আরযীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই যে, বন্ধুরা খুশি মনে নিজের খরচে বিভিন্ন জামাতে যাবেন এবং কুরআন করীম শেখা ও শেখানোর ক্লাসের ব্যবস্থা করবেন এবং এরই মাধ্যমে ঐ জামাতের তরবিয়ত যেন হয়ে যায়। আর কুরআনের শিক্ষাকে নিজের জন্য শিরোধার্য করে নিয়ে প্রত্যেকে যেন অন্যের জন্য এক আদর্শ হয়ে যান। (খুতবাতে নাসের, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৫৭)

হুযূর আনোয়ার (রাহে.) একই খুতবায় বলেন যে, আমাদের প্রত্যেক বছর ওয়াকফে আরযীতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ওয়াকফকারী চাই এটি ছাড়া সঠিক ভাবে জামাতের তরবিয়ত করা সম্ভব নয়।

ওয়াকফে আরযী মুযাহিদদের করণীয়

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ওয়াকফে আরযী-তে অংশগ্রহণকারীদের দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে ১৮ই মার্চ ১৯৬৬ সালের জুমুআর খুতবায় বলেন,

(১) কুরআন শেখানো ঃ হুযূর (রাহে.) বলেন যে,বড় বড় কাজ যা বন্ধুদেরকে করতে হবে তার মধ্যে একটি হলো কুরআন করীম নাযেরা পড়ানো, কুরআন করীম তরজমা পড়ানো, এছাড়া জামাতের পক্ষ থেকে যে সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলোর নিগরানী করা এবং তা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪)

(২) অমনোযোগী লোকদেরকে মনোযোগী করা ঃ দ্বিতীয়ত অনেক এমন জামাত থেকে অভিযোগ এসে থাকে যে, তাদের মধ্যে কিছু মানুষ ঈমানের দিক থেকে অথবা জামাতের কাজের দিক থেকে, ততটা মনোযোগী নয় যতটা একজন আহমদীর হওয়া উচিত। তাই ঐ সকল ওয়াকফে আরযীতে অংশগ্রহণকারীদের থেকে কাউকে কাউকে এমন লোকদের সংশোধনে তরবিয়তের কাজও নেওয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে, তারা যেন এমন অমনোযোগী জামাত ও জামাতের সদস্যদের মনোযোগী করার চেষ্টা করে। (খুতবাতে নাসের, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪)

(৩) ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করা ঃ একজন উত্তম আহমদী হওয়ার জন্য আবশ্যক সে যেন একজন উত্তম নাগরিক হয়। কিন্তু অনেক এমন ব্যক্তি আছে যারা ছোট ছোট বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে থাকে, যদিও এটি করা একজন আহমদীর জন্য একেবারেই উচিত নয়। যখন এই ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায় তখন জামাতের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং যে সকল ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্ তা'লা দুই থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত আমার এ তাহরীক ওয়াকফে আরযী করার তৌফিক দিয়েছেন তাদের এই বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে এবং জামাতের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মিটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। (খুতবাতের নাসের, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪)

(৪) তরবিয়ত এবং আত্মজিজ্ঞাসা ঃ তাহরীকে ওয়াকফে আরযীর দ্বিতীয় উত্তম কল্যাণ হলো এই যে, যে সকল লোক ওয়াকফে আরযীতে যায়, পূর্ব থেকে তাদের নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হয়। এছাড়া যাওয়ার পূর্বে তাদের নিজেদের কিছু দূর্বলতার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং দোয়ার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়ে যায়। আর এমন ব্যক্তি যেখানেই গিয়ে অবস্থান করে থাকে সেখানকার লোকেরাও উপকৃত হয়ে থাকে। (খুতবায়ে নাসের, ৭ম খন্ড, পৃ: ২০)

(৫) আত্মশুদ্ধি ঃ তাহরীকে ওয়াকফে আরযী প্রকৃতপক্ষে আত্মশুদ্ধির জন্য নিজেকে আত্মজিজ্ঞাসা করা এবং অন্যদেরকে এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জারি করা হয়েছে। (খুতবায়ে নাসের, ৭ম খন্ড, পৃ: ২৪)

(৬) নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়া ঃ ওয়াকফে আরযীর একটি কল্যাণ হলো এই যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি হওয়া, আর এই মহান কাজটি খোদা তা'লা বর্তমানে জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে নিতে চাচ্ছেন। (অর্থাৎ) সকল মানুষকে একটি পরিবারের ন্যায় বানানো হোক আর আমাদের চেষ্টা এমনটিই থাকা উচিত। (খুতবাতে নাসের, ৭ম খন্ড, পৃ: ২০)

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সৈয়্যদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ১৭ই এপ্রিল ২০১৩ সালে স্পেনের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার মিটিংয়ে সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীকে জিজ্ঞাসা করেন, "লোকেরা কি ওয়াকফে আরযী করে? আপনাদের আমেলার সদস্যদেরকে বলুন ওয়াকফে আরযী করতে। আপনার নিকট ওয়াকফে আরযীর রেকর্ড থাকা উচিত আর এই বিষয়ে আপনার জ্ঞান থাকা উচিত। যে ব্যক্তি নিজে নিজেই প্রোগ্রাম তৈরী করে চলে যায় আর বলে আমি ওয়াকফে আরযী করেছি তাহলে সেটি ওয়াকফে আরযী নয়। (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ২৯শে এপ্রিল ২০১৩ সাল)

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ওয়াকফে আরযী করার তৌফিক দান করুন। আর আমরা যেন প্রকৃত পক্ষে এই তাহরীকের বরকত ও কল্যানের ভাগীদার হতে পারি- আমীন ।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৫৭)

দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা

(ঘ) ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের মোকাবেলা

এখন আমরা ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমন সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করছি যাতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে একদিকে যেমন দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের ফেতনার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, অন্যদিকে মহাকরুণাময় আল্লাহ্ তা'লার ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবও যথাসময়ে ঘটেছে।

* "আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদের নিকট ওহী নাযেল করে জানাবেন যে, একটি দল বের হয়েছে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই, তুমি আমার বান্দাদের পর্বতে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ কর। মোটকথা, এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রকাশ করবেন, প্রত্যেক উচ্চতা হতে তাদের অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে।" (মুসলিম)

* "মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখে দাজ্জাল দ্রবীভূত হয়ে যাবে যেভাবে পানিতে লবণ দ্রবীভূত হয়"। (মুসলিম)

* "মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিবাদকারীদের দোর-গোড়া পর্যন্ত দাজ্জালকে অনুসরণ করবেন এবং সেখানে তাকে বধ করবেন।" (মুসলিম)

* "দাজ্জালের নানা প্রকার ভোজ-বাজি প্রদর্শনকালে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আবির্ভূত করবেন।" (মুসলিম)

* "দাজ্জালের অনুসন্ধানে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বের হবেন এবং লুদ নামক স্থানে গিয়ে মোকাবেলা করে তাকে হত্যা করবেন।" (মুসলিম)

* "ইয়ানযিলা ফিকুম ইবনে মারইয়ামা হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসিরুস সালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাউল জিযইয়া।"

অর্থ: "ইবনে মরিয়ম নাযেল হবেন যিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসাকারী ন্যায় বিচারক হবেন এবং তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন এবং 'জিযিয়া' রহিত করবেন" (বুখারী)।

* "ইউশেকুমান আশা মিনকুম আহইয়ালকা ইসাবনা মারইয়ামা ইমামান মাহ্দীয়্যান ওয়া হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসিরুস সালীবা ওযা ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাউল হারব"।

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্দী এবং মীমাংসাকারী ন্যায় বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ধর্ম যুদ্ধ রহিত করবেন।" (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, জিলদ-২)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর আলোকে এটা স্পষ্ট যে, ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জালী ফেতনা হতে উদ্ধারের জন্য বিশ্ববাসীকে ইসলামের আলোকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব অবধারিত ছিল। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের আবির্ভাব সংঘটিত হয়ে যাওয়া কি একথা প্রমাণ করে না যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আগমন করেছেন?

বস্তুত:পক্ষে ইয়াজুজ-মাজুজ হলো বর্তমান কালের দু'টি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিজোট, যারা পরস্পর মারাত্মক প্রতিযোগিতা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে। এই ফেতনারই আরেকটি দিক হলো সাধু পৌল কর্তৃক প্রচারিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস যা দাজ্জালী ফেতনা রূপে বিশ্বের চতুর্দিকে বর্তমান কালেই সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বস্তুত: সামরিক ও রাজনৈতিক বিপদাবলী (ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যাবলী (দাজ্জালী ফেতনা) এই উভয় দিক হতেই আজ পৃথিবীতে মহা সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজমান। এই

পরিস্থিতিতে এশপ্রতিশ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সুমহান শান্তি-বাণীকে পুণনরায় বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়-আকীদার অসারতা প্রতিপন্ন (ইয়াকসিরুস সলীবা) করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যথা সময়ে আগমন করেছেন।

তিনি ইসলামের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আহমদীয়া জামাত নামে প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ পথে ইসলাম প্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে। তিনি যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ পথে ইসলাম প্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে।

তিনি যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী সাহায্য-পুষ্ট নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) একজন মানব রাসূলই ছিলেন, খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না এবং তিনি অতীতের সকল নবী রাসূলের মতই ইন্তেকাল করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আকাশে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাস একটি কাল্পনিক ও যুক্তিহীন ধারণা মাত্র। হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে উত্তোলন এবং সেখানে সশরীরে জীবিত থাকা সম্পর্কিত বিশ্বাস বা আকিদার সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ তথ্য বা নিদর্শন প্রকাশের জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে কোন মানুষের ক্ষমতা আছে কি?

এই সকল বিষয় এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, মানবজাতি এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে যে বর্তমানে তাদের জন্য দু'টি পথ খোলা রয়েছে: (১) এই মহা প্রতিশ্রুত যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ তথা ইসলামের পুণর্জাগরনের নেতৃত্বদানকারী হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে বিশ্ববাসী প্রতিশ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার মহা প্রাচীরের আশ্রয়তলে ইহজীবনেই স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ করতে সক্ষম হবে, অথবা (২) ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দাজ্জালের চক্করে পড়ে বিশ্ববাসী ক্রমবর্ধমান সংকটাপন্ন বিশ্ব-পরিস্থিতির নিষ্পেষণে দলিত-মথিত হয়ে ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হতে থাকবে।

এই দু'টি পথের মধ্যে একটিকে অবশ্যই 'পছন্দ' করতে হবে। একটি হলো প্রতিশ্রুত শান্তির পথ এবং অন্যটি ধ্বংসের পথ। যে কোন একটি পথ পছন্দ করার এই অধিকার জন্মগত, স্বাধীন এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলে স্বীকৃত (পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী: লা ইকরাহা ফিদ্দীন)।

সুতরাং সুধীসজ্জন এবং পবিত্র-চিত্তদের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হৃদয়ে এ সকল বিষয়ে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীস সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

"মানুষের মাথায় যে কাল্পনিক দাজ্জাল রয়েছে তার কোন চিহ্ন বা লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। অপরদিকে আমরা দেখি, খৃষ্টানদের ফিতনা অনেক বেড়ে গেছে আর পৃথিবী তাদের ষড়যন্ত্রে ভরে গেছে। তাই বুঝা গেলো, খৃষ্টানদের প্রাধান্যের যুগে মসীহের অবতরণের অর্থ হলো, খৃষ্টান পাদ্রিরাই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল নতুবা এই স্ববিরোধী হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এ জাতীয় হাদীসের যে অর্থ বাস্তবে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের পক্ষে সে অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক"। (হামামাতুল বুশরা)

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মসীহ্ ইয়াজুজ মাজুজের সাথে যুদ্ধ করবেন না আর বুখারী শরীফ অনুযায়ী, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ খৃষ্টানদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না। তাই প্রমাণিত হলো, ইয়াজুজ মাজুজই খৃষ্টান জাতিভুক্ত।

আর এ-ও প্রমাণিত হলো, মসীহ্ মাওউদ তাদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না বরং কঠিন সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইবেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এথেকে আরও প্রমাণিত হলো, মসীহ্ মাওউদ ধরাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের আধিপত্যের যুগে আসবেন। তিনি নমনীয়তার দ্বারপথে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সেভাবে প্রবেশ করবেন যেভাবে তারা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের জন্য প্রবেশ করেছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নেবেন না কেননা তারা ধর্মের কারণে তরবারী হাতে নেয়নি।

তিনি তাদের সাথে প্রজ্ঞা ও উত্তম নসীহতের ভিত্তিতে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হবেন আর উদাসীন সীমালঙ্ঘনকারীদের বাহ্যিকভাবে হত্যা করবেন না। আর মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াজুজ-মাজুজ তীর এবং তাদের ধনুককে ইন্ধনের মত জ্বালানো হবে আর মুসলমানরাই এগুলোকে পোড়াবে। হে মুসলমানগণ! এটি হলো হাদীসের একটি অন্যায় প্রক্ষেপণের উদাহরণ। কেননা তীর ধনুকের যুগের এখন অবসান ঘটেছে, আর আগ্নেয়াস্ত্র এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। "চাইলে মানতে পারো নতুবা অস্বীকারও করতে পারো।" (হামামাতুল বুশরা)।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমেদ বুলবুল

মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব

“এবং তোমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (কেননা) অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৫)। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার বা ওয়াদা কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারও ওপরে কোন দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হলে, তা সঠিক ভাবে পালন করা হচ্ছে ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব।

“হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত (কাজ) যে তোমরা তা বল যা কর না”। কুরআন করীমের সূরা আস্ সাফ্-এর ৩ ও ৪ নং আয়াতের এই বাণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পালন করা বিষয়টি খুব দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। সত্যিকার মুসলমান কথায় ও কাজে এক। মুসলমান যা বলে, তা করে। বড় বড় বুলি আর শূন্য আস্ফালন কোনই কাজে আসে না। এরূপ ঈমান যা কার্যে রূপান্তরিত হয় না, তা মুনাফেকী বা ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “মহান আল্লাহ্ বলেন, বিচার দিবসে আমি তিন ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্ক করব, যে আমার নামে ওয়াদা করে এবং তা ভঙ্গ করে। যে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস বানিয়ে বিক্রয় করে ও তার অর্থ গ্রাস করে এবং যে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে তার দ্বারা চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়ে প্রাপ্য অর্থ দেয় না। (বুখারী)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “যে স্বামী স্ত্রীর সাথে ও যে স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আমার জামাতভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে, যা বয়আত করবার সময় করেছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে সে আমার জামাতভুক্ত নয়।” (কিশতিয়ে নূহ)।

আজ বিশ্বে যত অশান্তি, এসবের মূলে রয়েছে বিশেষ করে ওয়াদার মূল্যায়ণ না করা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন কাজ করতেও মানুষ আজ দ্বিধা করে না। আসলে মানুষ বুঝে না এটা শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়া নয় বরং এটা হচ্ছে খোদা তা’লাকে ধোঁকা দেওয়া। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানকে কথায় ও কাজে এক হতে হবে।

ওয়াদা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জামাতে আহমদীয়া সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত যখন কেউ হয়, তখন কিন্তু সবাই একটি ওয়াদা করে থাকে, যাকে আমরা বয়আত বলে থাকি। আর এই বয়আতের অর্থই হলো অঙ্গীকার বা ওয়াদা। মৌখিক বয়আতের কোন মূল্য নেই যে পর্যন্ত না এটা কাজে পরিণত করা হয়। কোন কিছুর ওয়াদা করা মানে সততার সাথে তা পালন করা। সূরা আন্ নাহল-এর ৯২নং আয়াতে বলা হয়েছে, আর তোমরা যখন (আল্লাহ্‌র সাথে) অঙ্গীকার কর (তখন) তোমরা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তা) ভাল করেই জানেন।

এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত মু’মিনদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝানো হচ্ছে। একজন প্রকৃত মু’মিন কখনই তার দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হতে পারে না। সূরা আন নাহলের ৯৬ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, ‘আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার নগণ্য মূল্যে বিক্রি করো না। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোন প্রকার ওয়াদা যেন কোন মূল্যে বিক্রি করা না হয়। কারো সাথে অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নির্দেশ যে ভঙ্গ করে তার কোন ধর্ম নেই।

অনেকে আছে কারো প্রলোভনে পড়ে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে। এই অবস্থা থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, অর্থাৎ ‘তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না,

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ‘প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য কিয়ামতের দিন একটি ‘নিশান’ (পতাকা) লাগানো হবে, এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ওয়াদা ভঙ্গকারী হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক। আর মু’মিনরা কখনও আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যতটুকু ওয়াদা করলে তার বরখেলাপ হবে না আমাদের ততটুকুই ওয়াদা করা উচিত। আমাদের যুগ খলীফা তার প্রতিটি জুমুআর খুতবায় যেভাবে আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের উচিত তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। তবেই আমরা কোন বিপদের সম্মুখীন হবো না। অতএব প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উচিত ওয়াদা রক্ষা করে চলা। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সকলকে ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব বুঝে তা প্রতিপালনের তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া, নাটোর

ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব

"হে যারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা কেন তাহা বল যাহা করো না? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তাহা বল যাহা কর না (সূরা আস্ সাফ্ ঃ ৩-৪)।

আল্লাহ্ তা'লার এই অমোঘ বাণী থেকে এটা স্পষ্ট-প্রতিষ্ঠিত যা খুব দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। সকল ভাষার জননী আরবী ভাষায় "মিসাকূন" প্রতিশ্রুতি বা বাংলায় ওয়াদাও বলা হয় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মূল ভিত্তি হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"– মহামূল্যবান এই বাণীটি হলো ইসলামের মূলমন্ত্র। বর্তমান দুনিয়ার সকল অশান্তি, অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলতা, অরাজকতা ইত্যাদির মূলেই রয়েছে "ওয়াদার বরখেলাফ্" করা আর ওয়াদার মূল্যায়ন না করা, ধোঁকা দেবার প্রবণতা বেশী। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আবেগাপ্লুত হয়ে সহজেই ওয়াদা দেয়া অত্যন্ত বদ-অভ্যাস যা মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সত্যবাদী হওয়া মুত্তাকী হওয়ার চিহ্ন। মানুষকে ধোঁকা দেয়া হলো খোদা তা'লাকেই ধোঁকা দেয়া। এটি মূলতঃ তাক্ওয়ার পপিষ্থী।

মহান প্রভু খুবই দৃঢ়ভাবে তাঁর ঐশীগ্রন্থে বার বার ও দৃঢ়ভাবে তাক্ওয়ার কথা বলেছেন। প্রকৃত মু'মিন তার কথায় ও কাজে এক অভিন্ন হয়ে থাকে। বড় বড় বুলি ও শূন্য-আস্ফালন কোন কাজেই আসে না। এরূপ ঈমান যা কার্যে রূপান্তরিত হয় না, আর এ ধরনের ওয়াদা যা বাস্তবায়িত করা হয় না, তা মুনাফেকী বা ভন্ডামী ছাড়া কিছুই নয়। হাদীস মতে "মু'মিনের ওয়াদা হাতে পেয়ে যাওয়ার মতো।" মূলত: অঙ্গীকার বা ওয়াদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। প্রকৃত মু'মিন নিজের ওয়াদা রক্ষায় ও আমানতের আমানতের সুরক্ষায় খুবই যত্নশীল। "এবং তোমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কারণ নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে" (১৭ ঃ ৩৫)।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন সম্প্রদায়কে ওয়াদা দিয়েছেন সূরা আন্-নূরের ৫৬নং আয়াতে–"তোমাদের মাঝে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাহাদের খলীফা নিযুক্ত করিবেন।" নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। মু'মিনগণের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি মুসলমানদিগকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহিত করা হয়েছে এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদাও স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। বর্তমান যামানায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সমূহের মধ্যে "খেলাফত" হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। মূলতঃ ৫৬নং আয়াতটি হলো মু'মিনগণের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ওয়াদার পরিপূর্ণ বিকাশ।

অঙ্গীকার বা ওয়াদা রক্ষা করা একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আনুগত্যের অঙ্গীকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আহমদীয়া সংগঠনে "বয়আত" অর্থাৎ অঙ্গীকার করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। বয়আত মানে "খেলাফতের জোয়াল" কাঁধে নেয়া অর্থাৎ নিজেকে খোদার কাছে বিক্রী করে দেয়া। মৌখিক বয়আতের কোন মূল্যই নেই। জেনে ও বুঝে সজ্ঞানে বয়আত করতে হয়। বয়আতের আর এক অর্থ হলো জবাবদিহিতা। অঙ্গীকার দুই রকমের। প্রথমটি হলো- "পাথিব জীবনের জন্য অর্থাৎ নিজ ত্রুটি ও মানুষের কাছে জবাবদিহিতা; দ্বিতীয়টি হলো "আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অর্থাৎ আত্মার কাছে-জবাবদিহিতা।" যুগ-খলীফার মুখনি:সৃত কথাগুলো কিন্তু ওয়াদা বা মূলতঃ অঙ্গীকার! অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হলো যে, শিষ্যের নিজেকে গুরুর সামনে লাশের মত হওয়া উচিৎ এবং নিজের সব ইচ্ছা ও বাসনাকে তাঁর জন্য কুরবানী করা আবশ্যক!

বান্দার সকল প্রতিশ্রুতি সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অবশ্য পালনীয়। "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদাকে পূর্ণ কর। যখন তোমরা কোন ওয়াদা কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভঙ্গ করিও না, কেননা তোমরা আল্লাহকে নিজেদের জামিন করিয়া লইয়াছ। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তিনি নিশ্চয়ই উহা জানেন" (১৬ঃ৯২)।

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না– অর্থাৎ ওয়াদা বলতে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি স্বাভাবসিদ্ধ যে বিশ্বাস ও তাঁর নৈকট্য লাভের যে স্বাভাবিক আকুতি ও প্রেরণা আল্লাহ্ পাক তার প্রকৃতিতে তা প্রোথিত করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কারো সঙ্গে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করে তার কোন ধর্ম নেই। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি মু'মিনদের দায়িত্বসমূহ বুঝায়। তিনি বলেছেন, "যখন তোমরা অঙ্গীকার কর তা সর্বদা পালন করার চেষ্টা করবে, কারণ অঙ্গীকার পালনকারীকে তিনি পছন্দ করেন এবং এতে কল্যাণ নিহিত আছে"।

হাদীসে আছে, "প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য কিয়ামতের দিন তার হাতে একটি নিশান (পতাকা) লাগানো হবে।" সর্বাপেক্ষা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাস ঘাতকতা হবে ইমামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। অতএব মু'মিন ব্যক্তি সর্বাবস্থাতেই প্রস্তুত থাকে যেন তার অঙ্গীকার পূরনে কোন খেলাফ না হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ পাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, খোদার এ গৃহ ক্বাবা এমনই সত্য সাক্ষ্যপূর্ণ এক প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন আর ঐক্যমতের সাহায্য সমর্থনপুষ্ট উৎসস্থল, যা সর্বকালে জীবন্ত

থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণকর্ম দ্বারা এমন এক উম্মতে-মুসলেমা প্রতিষ্ঠিত করা যাতে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামত কাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে। ঐশী প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতা ধরেই আঁ হযরত (সা.) এর আবির্ভাব হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) সেই প্রতিশ্রুত শিক্ষক যিনি সর্বদাই ঐশী সাহায্যে সমৃদ্ধ হতেই থাকবেন।

আল্লাহ্ তা'লার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর বাক্যালাপ কিন্তু "প্রতিশ্রুত- ত্রিশ রাত্রে" শেষ হয়েছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য! সূরা আন্ নূর ৫৬নং আয়াতে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করার যে ওয়াদা মহান আল্লাহ্ মানবমন্ডলীকে দিয়েছেন তা জগতে আহমদীয়া খিলাফতের ধারায় কতই না উজ্জ্বলাকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্!!

"তোমরা সেই মহিলার মত হইও না যে শক্তি ব্যয় করে কাচা সূতাকে পাকা করিবার পর কাটিয়া খন্ড-বিখন্ড করিয়াছিল। তোমরা নিজেদের ওয়াদাকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোঁকাস্বরূপ ব্যবহার করিতেছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে।" বান্দার আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং যতক্ষণ না তাঁকে সকল লক্ষ্য ও অর্জনের মালিক মনে না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে এমন এক উম্মতের উত্থান ঘটানোর সুসংবাদই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ পাক দিয়েছিলেন এবং খোদার কসম, তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

মলফুযাতে আছে, "ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য খোদা তা'লা তাঁর ওয়াদানুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর ওফাতের পর অদ্যাবধি পঞ্চম খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে ইসলামের বিজয় যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলছে– (আল্‌হামদুলিল্লাহ্)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভের পাশাপাশি কিয়ামতকাল অবধি অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার লাভ করবেন। সকল পার্থিবতার ওপরে আহমদীয়াতের বিজয় প্রাধান্য লাভ করবে ইনশা'ল্লাহ্। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ওয়াদা পালনের তৌফিক দিন (আমীন)।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সকল জামাতের প্রত্যেক আমেলার সদস্যের নিকট বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে যে, আপনারা যখনই কোন সংবাদ **'আহমদী'** পত্রিকায় ছাপানোর জন্য আমাদের নিকট আবেদন জানাবেন তখন অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে উক্ত সংবাদের তথ্যাদি স্পষ্ট আকারে পাঠাবেন। অনেক সময় আমাদের কাছে এমনও সংবাদ আসে যাতে কাঙ্খিত অনুষ্ঠানের তারিখসহ আরো অনেক তথ্যাদি দেয়া হয় না। এমতাবস্থায় সেসকল সংবাদ ছাপানো আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে এ-ও জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত সংবাদ আমরা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে থাকি এবং আমরা চাই আপনাদের জামাতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ ছবিসহ ছাপানো হোক।

এজন্য আমাদের বিনীত আবেদন, আপনারা যদি সংবাদ প্রেরণের সাথে উক্ত অনুষ্ঠানের এক কপি ছবিও সংযুক্ত করে দেন তবে আমরা সানন্দে তা ছাপাবো, ইনশাআল্লাহ্।

বিনীত নিবেদক
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, আহমদী পত্রিকা।

সংবাদ

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/১০/২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার শ্যামপুর জামাতের হালকা শাহবাজপুর অর্থাৎ খাকসারের গ্রামের বাড়িতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জনাব আমিরুল ইসলাম সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল করিম, নযম পাঠ করেন জনাব নাসের আহমেদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরুব্বী সিলসিলা ঢাকা, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আলী, শরিফ আহমদ মুরুব্বী সিলসিলা, জাকির হোসেন মোয়াল্লেম এবং খাকসার আবুল কাশেম সেক্রেটারী তবলীগ। উক্ত জলসায় ৩৯ জন আহমদী এবং ১৪০ অ-আহমদীসহ মোট ১৭৯ জন উপস্থিত ছিল। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৪ টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, এরপর নযম পাঠ করা হয়। নযমের পর যথাক্রমে রসূলে করীম (সা.) এর জন্ম ও বাল্যকাল, নবুওয়াত লাভ ও আল্লাহ্‌র ইবাদত, মু'মিন ক্রীতদাসদের ওপর মক্কার লোকদের অত্যাচার, মদীনায় ইসলাম প্রচার এ বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করেন যথাক্রমে সাজেদা আক্তার, জাকিয়া সুলতানা, জেসমিন আকতার, আমাতুর মতিন, আমাতুল মজিদ ও মোস্তারিন আকতার।

সবশেষে দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা মিসেস মোস্তারীন আকতার। এ অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন ১১ জন।

আমাতুল মজিদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২২/১০/২০১৬ তারিখে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুল করিম। হাদীস পাঠ করেন গুলশান আরা, অমৃতবাণী পাঠ করেন রেজওয়ানা রশিদ, নযম পাঠ করেন সুইটি জাবের ও সালহানা তৌহিদ। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন আনোয়ারা বেগম– তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু 'মহানবী (সা.) এর মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ' তারপর বক্তৃতা রাখেন তাসমিয়া মাহবুব, 'মহানবী (সা.)-এর ক্ষমার সুমহান দৃষ্টান্ত, দুরূদ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, রেজওয়ানা রশীদ এবং সবশেষে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট দিলরুবা জামান মহানবী (সা.) এর বিনয় ও নম্রতা বিষয়ে।

সবশেষে আরবি কাসিদা পাঠ করেন সুইটি জাবের এবং আমাতুল করিম। প্রেসিডেন্ট সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৪ জন লাজনা-নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

দিলরুবা জামান

কটিয়াদি জামাত পরিদর্শন ও সানাত ও তেজারাত এর ওপর সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

মোহতরম সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর নির্দেশক্রমে খাকসার গত ২৩/০৯/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদি পরিদর্শন করি। সেই দিন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কটিয়াদির কায়েদ নির্বাচন ছিল কিন্তু কোরাম সংকটের কারণে নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব হয়নি। তাই স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে এক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসের আলোচ্যসূচির পাশাপাশি খাকসার ন্যাশনাল সেক্রেটারী হিসাবে সানাত ও তেজারাত-এর ওপর আলোকপাত করি। দারিদ্রতা দূরীকরণে জামাতের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করি।

স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব জামাতকে শক্তিশালী করার জন্য ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণের বেশী বেশী সফর প্রত্যাশা করেন। এ সভায় উপস্থিত ছিল ৫০ জন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওন এর ২২তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

গত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর-২০১৬ রোজ শুক্র ও শনিবার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওন এর ২২তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা-২০১৬ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। ২৮ অক্টোবর রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ এবং আসর নামাযের পর বেলা ৩ টায় ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সদর জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, যয়ীমে আলা (তারুয়া)।

আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব এনামুল হক (ইন্টু), কোড্ডা। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ইজতেমার চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আল-আমীন। ইজতেমায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব নঈম আলম খান, কায়েদ উমুমী বাংলাদেশ। বর্তমান হুযূর (আই.) এর নির্দেশে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম আলা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বাদ মাগরিব এবং এশার নামায জমা করা হয়। নামায শেষে ইজতেমার প্রতিযোগিতার ১ম পর্ব শুরু হয়। উক্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল কুইজ, পয়গামের রেসানী, বালিশ বদল এবং ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ। রাতের খাবার এবং নিদ্রা যাপনের পর ২৯ অক্টোবর বাজামত তাহাজ্জুদ নামায, ফজর নামায এবং দরসে কুরআন পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

নামায ফজরের পর প্রতিযোগিতার ২য় পর্ব প্রথমে ব্যায়াম প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা হয়। অতঃপর ইজতেমার মূল পর্ব যথা– নাযেরা কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা, কুরআন মুখস্ত তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা, নযম পাঠ উর্দু ও বাংলা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, দ্বীনি মালুমাত: লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং আযান প্রতিযোগিতা।

যোহর এবং আসর নামায শেষে বেলা ২.৩০ মিনিটে ইজতেমার সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকারী যথাক্রমে জনাব এস.এম. আব্দুল হক এবং জনাব এস.এম. নঈম-উল্লাহ্ (ঘাটুরা)। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ইজতেমার সেক্রেটারী জনাব মোস্তাক আহমদ ভূঁইয়া 'আনসারুল্লাহ্‌র তালিম-তরবিয়তে অগ্রণী ভূমিকা' এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আনসারুল্লাহ্ এর সাংগঠনিক বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব নঈম আলম খান কায়েদ উমুমী, বাংলাদেশ। বিগত দিনের কর্মতৎপরতা ও আগামী দিনের কর্মসূচি এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোশারফ হুসেন, রিজিওনাল নাযেমে আলা। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত রিজিওনাল ইজতেমায় ২০ টি মজলিস হতে মোট ১৫৯ জন আনসার এবং খোদ্দাম ও আতফালসহ সর্বমোট ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোশারফ হোসেন
রিজিওনাল নাযেমে আ'লা

রঘুনাথপুর বাগ-এর কুরআন ক্লাসের ছাত্রদের ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুরবাগ-এর কুরআন ক্লাসের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ ফজর জনাব আতিয়ার রহমান, প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. রঘুনাথপুর বাগ-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার উদ্বোধন করা হয়। এরপর কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থসহ নামায লিখিত পরীক্ষা, আযান, স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা, কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রেসিডেন্ট সাহেব ও সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত উপস্থিত থেকে পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে কুরআন ক্লাসের ১৬ জন ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর রিজিওনের রিজিওনাল ইজতেমা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

গত ২৮ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে দুইদিন ব্যাপী রংপুর রিজিওনাল ইজতেমা সৈয়দপুরের নবনির্মিত মসজিদ প্রাঙ্গনে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই রিজিওনের ১৬ টি মজলিস থেকে ১১০ জনের অধিক আনসার, ১৪ জন যয়ীম/যয়ীমে আলা প্রতিনিধিবৃন্দ, দুইজন জেলা নাযেম ইজতেমায় শরীক হন। কেন্দ্র থেকে মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এবং নায়েব সদর আউয়াল মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন জামাত থেকে আগত ছয়জন প্রেসিডেন্ট (আনসার) উপস্থিত ছিলেন। ২৮ অক্টোবর জুমুআর নামাযের পর মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আহাদ পাঠ, দোয়া ও নযমের পরে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব নজিবর রহমান, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। নসীহত মূলক ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে জনাব খলিলুর রহমান, সাবেক নায়েব সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম রিজিওনাল নাযেম, রংপুর রিজিওন। এরপরে ধর্মীয় জ্ঞানের ওপরে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মাগরিব ও এশা একত্রে জমা নামাযের পরে মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে সকল আনসার, যয়ীম/যয়ীমে আলা সাহেবানদেরকে নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মোহতরম সদর সাহেব বিভিন্ন মজলিস থেকে আগত যয়ীম/যয়ীমে আলা, প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্য শোনেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দান করেন। সবাইকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার আহ্বান জানান এবং আসন্ন ইজতেমা ও শূরায় অধিক সংখ্যক আনসার সাহেবানদের উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রাত সাড়ে এগারোটায় সরাসরি সম্প্রচারিত হুযূর (আই.) এর খুতবা শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ অক্টোবর প্রায় শতাধিক মুসল্লির উপস্থিতিতে বাজামাত তাহাজ্জুদ, ফজর ও দরসে কুরআনের পর ধর্মীয় জ্ঞানের ওপরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১ টায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নায়েব সদর আউয়াল মোহতরম আব্দুল জলিল সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়। প্রথম স্থান অধিকারী বৃন্দের কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী। মওলানা আব্দুল মতিন মুরুব্বী, ও খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম, রিজিওনাল নাযেম। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আবুল কাশেম, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি ও জেলা নাযেম বৃহত্তর রংপুর। এরপর সভার সভাপতি নায়েব সদর আউয়াল সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সফল সমাপ্তি হয়।

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম
রিজিওনাল নাযেমে আ'লা

আশুলিয়া জামাত পরিদর্শন ও সানাত ও তেজারাত-এর ওপর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০৯/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আশুলিয়া পরিদর্শন করি। জামাতের পক্ষ হতে এটাই আমার প্রথম স্থানীয় জামাত সফর ছিল। নামাযের পর সানাত ও তেজারাত এর ওপর এক সাধারন সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দরিদ্রতা দূরীকরণে জামাতের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করি। সকলের অনুরোধ ক্রমে আমি জার্মানি জলসার অভিজ্ঞতা তুলে ধরি। প্রেসিডেন্ট সাহেব তার বক্তৃতায় খাকসারের স্থানীয় জামাত সফরের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসহ বেশী বেশী সফর প্রত্যাশা করেন। সেখানে মোট ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই জামাতের প্রায় সকলেই কোন না কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ কর্মজীবী, আলহামদুলিল্লাহ্।

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, সানাত ও তেজারাত

রঘুনাথপুর বাগ জামাতে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৯/১০/২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগ এর উদ্যোগে জনাব বিল্লাল হোসেন-এর বাড়িতে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব অহিদ মিয়া। পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত করেন জনাব সোহেল রানা। বাংলা নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আরমান। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব সোহেল রানা। পবিত্র কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন খাকছার। এরপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩২ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা ও ২ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এস.এম. মাহমুদুল হক

বিশেষ দোয়ার আবেদন

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের একমাত্র পুত্র সন্তান কাশিম রাজ্জাক বেশ কিছুদিন যাবত অসুস্থ্য অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তার বয়স মাত্র দেড় বছর। সে একজন ওয়াকফে নও সন্তান এবং তার ওয়াকফে নও নম্বর: ২৯০৫৬। টাইফয়েড হবার কারণে তার শরীরে রক্তস্বল্পতা এবং হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তার আশু রোগমুক্তির জন্য বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
আব্দুর রাজ্জাক ও জান্নাতুল ফেরদৌসি
ধানগড়া, গাইবান্ধা জামাত

উথলিতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ১১তম রিজিওনাল ইজতেমা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

গত ২০ ও ২১ অক্টোবর উথলী বায়তুস সোবহান মসজিদ প্রাঙ্গনে কুষ্টিয়া চুয়াডাংগা রিজিওনের ১১তম রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৭ টি মজলিস থেকে ৪০ জন আনসার অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর সাহেবের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব নঈম আলম খান সাহেব, নায়েব সদর ও তার সফরসঙ্গী জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান সাহেব এবং আরও উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল নাযেমে আ'লা জনাব মুজিবর রহমান সাহেব ও জেলা নাযেমে আলা জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সাহেব। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল: কুরআন তিলাওয়াত, উর্দু ও বাংলা নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ, বালিশ বদল ও ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় ২০/১০/২০১৬ তারিখ বাদ এশা।

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করা হয়। রাত ৯ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়। তারপর মেহমানদেরকে রাতের খাবার খাওয়ানো হয়। উথলির সকল আনসার খোদ্দাম আতফাল একত্রে মেহমানদেরকে আন্তরিকতার সাথে খেদমত করেন সর্বক্ষণ খোঁজ খবর রাখেন। উল্লেখ্য, জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম শুভ মুরুব্বী সিলসিলাহ্‌ অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেহমানগণের যাতে কষ্ট না হয় সবসময় খেয়াল রাখেন এবং নিজেও অত্যন্ত নমনীয় ও সহনশীলতার সাথে খেদমত করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন।

২য় অধিবেশন শুরু হয় ২১/১০/২০১৬ শুক্রবার ভোর চারটা হতে সকলে একত্রে মসজিদে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে শুরু হয় তারপর ফজরের নামায আদায় করে সকলকে চা বিস্কুট খাওয়ানো হয়। তারপর ভোর থেকেই কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা, নযম, বক্তৃতা হয় এবং সকাল ৮টায় মেহমানদেরকে নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর বেলা ১০ টার সময় ১১ টা পর্যন্ত এক ঘন্টা লিখিত পরীক্ষা হয়। তারপর খেলাধূলা প্রতিযোগিতা হয় ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

তারপর ২১/১০/২০১৬ রোজ শুক্রবার একত্রে জুমুআর নামায আদায়ের সাথে আসর জমা করা হয়। নামায শেষে বেলা ২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত এক ঘন্টা ব্যাপী খাওয়া পর্ব শেষ করা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী বেলা ৩ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করা হয়। তারপর রিজিওনাল নাযেমে আ'লা জনাব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সাহেব স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। তারপর জেলা নাযেমে আলা এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ্‌ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান অতিথি, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ নঈম আলম খান সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন, দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করান তারপর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন

পুণ্যবান সন্তান লাভের দোয়া

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

(সূরা মরিয়ম, ১৯: ৫-৭)

অর্থ: 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার হাড়গোড় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যের দরুন আমার মাথার চুল উজ্জ্বল-শুভ্র হয়ে গেছে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরপরও তোমার কাছে দোয়া করে আমি কখনো ব্যর্থ হই নি। আর নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পর আমার আত্মীয়-স্বজনদের (আচরণ) সম্পর্কে ভয় করি। (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর। যে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং ইয়াকূবের বংশধরদের উত্তরাধিকারীও হতে পারে। আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাকে তুমি (তোমার) অত্যন্ত সন্তোষভাজন করো'।

বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক "আহমদী" পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

তালশহর জামাতের মসজিদ উদ্বোধন

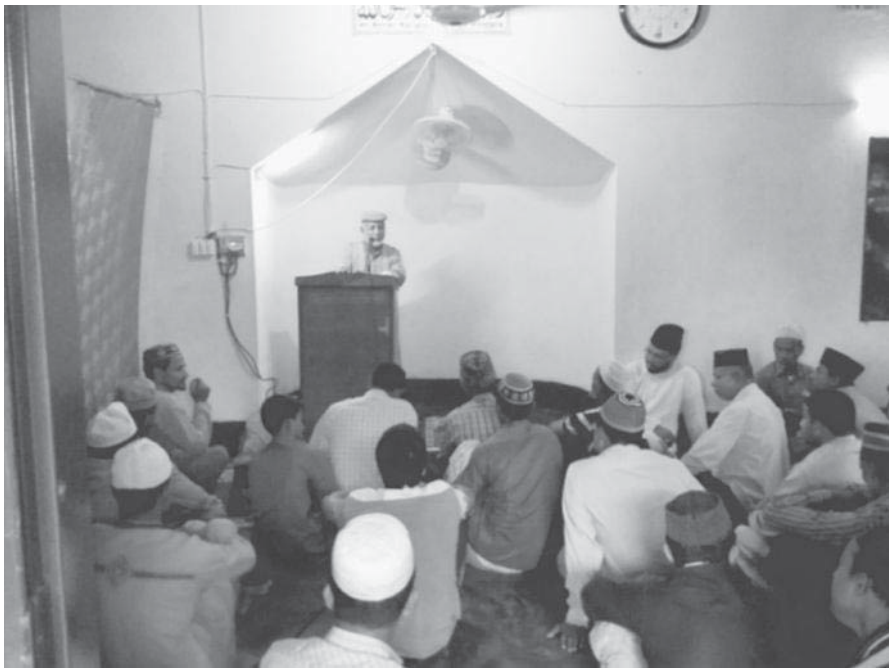

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

গত ৪ঠা নভেম্বর, ২০১৬ রোজ শুক্রবার মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উপস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তালশহর-এর নবনির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। তালশহর জামাত বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী জামাত। এদেশে আহমদীয়াতের প্রায় শুরুলগ্ন থেকেই এ জামাত বিদ্যমান। অনেক পুরনো হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোন মসজিদ ছিল না। একটি নামায ঘর বানিয়ে সেখানে নামায পড়া হত। নিষ্ঠাবান ১০টি পরিবারের বসবাস এখানে। বর্তমানে সেখানকার প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জামাতের সবার আন্তরিক কুরবানীর ফলে সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর ভাইদের অবদানও অনস্বীকার্য। এ জামাতের সকল আহমদীর নিষ্ঠা এবং ত্যাগের ফলেই গড়ে উঠেছে এই মসজিদ। আল্লাহ্ তা'লা এখানকার আহমদীদের এই মসজিদকে আবাদ করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

রিপোর্ট- ইশায়াত দপ্তর।

রাজশাহীর বাগমারায় মনোমুগ্ধকর মসজিদের উদ্বোধন

মসজিদের বারান্দা

রাজশাহী জামাতের অধীনে একটি পকেট বাগমারা, মচমইলে প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রথমে সে জামাতের হালকা ছিল। ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'লা এ হালকাতে স্বীয় বরকত নাযিল করতে থাকেন। যেভাবে চারা থেকে একটি গাছ মহীরূহে পরিণত হয় তদ্রুপ এ হালকাটিও গত ৪-৫ বছর পূর্বে বৃক্ষরূপ একটি জামাতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় জামাতের সদস্যদের কুরবানীর ফলে প্রথমে সেখানে গড়ে ওঠে একটি টিনের মসজিদ। আর এই মসজিদটিই গত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ইতিহাসের অংশ হয়ে রইল। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এই মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলা হল। এর আগে এদেশের কোন মসজিদে প্রথমবার ১৯৯৯ সালে খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে বোমা হামলা হয়েছিল যাতে শহীদ হয়েছিলেন সাতজন আহমদী এবং আহত হয়েছিলেন আরও অনেকে। এবার আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় কোন প্রাণহানি হয় নি। আহত হয়েছিলেন তিনজন। এরা হলেন- মোহাম্মদ মইজউদ্দিন, মোহাম্মদ সাহেব আলী এবং ছোট শিশু মোহাম্মদ নয়ন।

এ ঘটনার পরে তাদের কুরবানীর কথা

মসজিদে নামাযে রত মুসল্লীগণ

দৃষ্টিপটে রেখে বাংলাদেশ জামাত সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করার পদক্ষেপ নেয়। মসজিদের অর্থায়নে এগিয়ে আসেন আমাদেরই এক নিষ্ঠাবান প্রবাসী ভাই আলহাজ্জ মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্‌ফার। গত ৪-৫ মাসের মধ্যে সেখানে নির্মিত হয় মনোমুগ্ধকর 'মসজিদে বায়তুল ইসলাম'।

মোয়াল্লেম জনাব এহতেশামুল বশীর সাহেব যখন রাজশাহী অঞ্চলে ছিলেন তখনই সেখানে টিনের একটি মসজিদ করা হয়েছিল এবং তিনিই সদ্য নির্মিত মসজিটিরও নির্মাণে সার্বক্ষণিক তত্তাবধানে ছিলেন। এছাড়া রাজশাহীর বর্তমান মুরুব্বী মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দিন সাহেবও অনেক অবদান রেখেছেন। জামাতের সকল সদস্যের ত্যাগের ফলে নির্মিত হয় এই মসজিদ। গত ৫ই নভেম্বর'২০১৬ তারিখে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবসহ আলহাজ্জ মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, আলহাজ্জ মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্‌ফার সাহেব প্রমুখের একটি কাফেলা সেখানে পৌঁছায়। অতঃপর ৬ই নভেম্বর'২০১৬ তারিখে 'মসজিদে বায়তুল ইসলাম'-এর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন, 'তোমরা নেক কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা কর'– এ আয়াতের বাস্তবায়ন যেন এখানে বেশ সুনিপুণভাবেই ঘটেছে। এক ভাইয়ের অবদানের কথা শুনে অপর আরো দুই ভাই এগিয়ে আসেন যেন একটি পুণ্য অর্জনের প্রতিযোগিতা ছিল। এভাবে মসজিদের নির্মাণ কাজের শেষ প্রান্তে আমাদের এক ভাই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে পুরুষ ও মহিলা নামাযিদের জন্য পৃথক ওযুখানা এবং বাথরুম তৈরী করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলের কুরবানী কবুল করুন, আমীন।

প্রকৃত ইসলামের বাণী সদা গুঞ্জরিত হচ্ছে সেখানে। তবলীগের কাজে ব্যস্ত রয়েছে সেখানকার সরল সহজ লোকজন। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দুটি অংশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম অংশ যোহরের পর বাইরে প্যান্ডেল টাঙিয়ে করা হয় এবং এরপর বিকেলে মসজিদের ভেতরে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে উপস্থিত ছিলেন সেখানকার ইউ.পি. চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব। তিনি উপস্থিত সবার সামনে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়া আরো শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের মোহাম্মদ কিবরিয়া সাহেব। এদের বক্তব্যে তারা সামাজিক সম্প্রীতির একটি প্রকৃষ্ট নমুনা তুলে ধরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সম্প্রসারণযোগ্য এই মসজিদে মোট ১৫০ জন মুসল্লী একসাথে নামায আদায় করতে পারবে। সুন্দর, পরিপাটি এবং মনোমুগ্ধকর এই মসজিদ যেন কেবল বাহ্যত আড়ম্বরপূর্ণই না থাকে বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে যেন বেশী বেশী মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার মাধ্যমে এটিকে আবাদ করার তৌফিক দেন– এই দোয়াই করি, আমীন।

রিপোর্ট- ইশায়াত দপ্তর

পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ওযুখানা এবং বাথরুম

স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবের হাতে
শতবার্ষিকী স্মরণিকা তুলে দিচ্ছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

Bangla Shomprochar Schedule, December 2016

এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ডিসেম্বর মাসের সময়সূচী

Date	Day	URDV	Description/Remarks
01/12/2016	Thursday	**Repeat**	Friday Sermon of Previous Week
02/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
03/12/2016	Saturday	REPEAT 726	13th Episode of Bornali, a Magazine Programe by Lajna members of Bangladesh.
04/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
05/12/2016	Monday	**REPEAT 727**	6th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
06/12/2016	Tuesday	**729**	28th Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
07/12/2016	Wednesday	**REPEAT 645**	8th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 8th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
08/12/2016	Thursday	**Repeat**	Friday Sermon of Previous Week
09/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
10/12/2016	Saturday	**730**	14th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.
11/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
12/12/2016	Monday	**731**	7th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
13/12/2016	Tuesday	**732**	29th Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
14/12/2016	Wednesday	**REPEAT 647**	9th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 9th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
15/12/2016	Thursday	**Repeat**	Friday Sermon of Previous Week
16/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
17/12/2016	Saturday	**733**	15th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.

Date	Day	URDV	Description/Remarks
18/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
19/12/2016	Monday	REPEAT 723	5th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
20/12/2016	Tuesday	734	30th Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
21/12/2016	Wednesday	REPEAT 650	10th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 10th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
22/12/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
23/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
24/12/2016	Saturday	REPEAT 730	14th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.
25/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
26/12/2016	Monday	735	8th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
27/12/2016	Tuesday	736	31st Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
28/12/2016	Wednesday	REPEAT 653	11th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 11th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
29/12/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
30/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
31/12/2016	Saturday	REPEAT 733	15th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.

Wassalam

21/10/2016

MOHAMMAD KHAIRUL HAQ
In-charge, MTA Bangla.

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 10th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th November, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com